আমাদের ছুটি
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
www.amaderchhuti.com
কালেঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্ট - বাংলাদেশ
আলোকচিত্রী- মহম্মদ মহিউদ্দিন

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

~ ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২০~

এই সময়ে বসে কোনো ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা সত্যিই বড় কঠিন মনে হচ্ছে। যখন প্রকৃতির রোষে অসংখ্য মানুষ বিপন্ন, কয়েকহাজার মানুষ মৃত। তবে শুধুমাত্র প্রকৃতিকে দোষারোপ করলে ভুল হবে। নিজেদের কবর আমরা নিজেরাই কি খুঁড়িনি? উন্নয়নের নামে গত কয়েকবছর ধরে উত্তরাখণ্ডের নদীগুলিতে একের পর এক বাঁধ তৈরি হয়েছে, হচ্ছে...। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সুবিধার জন্য পাহাড়ের অগম্য জায়গাতেও পাথর ফাটিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে গাড়ি চলার পথ। হিমালয়ের শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্জনতাকে বেচে দেওয়া হচ্ছে পুণ্য অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নামে আরও বেশি পর্যটককে টেনে আনবার জন্য। আমরা আসলে পাহাড়কে, হিমালয়কে ভালোবাসতে পারিনি, ভালোবাসতে পারিনি পাহাড়ি গ্রামের শান্তিপ্রিয় খুব সাধারণ মানুষগুলিকে। নিজেদের ভালোলাগার জন্য শুধুই তাদের ব্যবহার করে গেছি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেঁচে যাওয়া দেশি-বিদেশি পর্যটকদের উদ্ধার করার কাজটা যতটাই কঠিন, তার চেয়েও কঠিন বোধহয় পাহাড়ের গায়ের ছোট ছোট যে গ্রামগুলি ভেসে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে - তার পুনর্বাসন। কয়েকবছর বাদে আমরা আস্তে আস্তে ভুলে যাব, আবার পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়বে কেদার-বদরীতে। কিন্তু প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠে নিজের ঘর, জলের নীচে হারিয়ে যাওয়া ফসলি জমি, পালিত পশু, আর বেঁচে থাকার উপাদানগুলির পুনর্নির্মাণে হয়তো এখানকার মানুষগুলোর একেকজনের বাকী জীবনটাই কেটে যাবে। আমরাও তো পারি এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে। 'আমাদের ছুটি'-র বন্ধুদের কাছে অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, সব হারানো মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান। আসুন একসঙ্গে আমরা হিমালয়ের জনজীবনকে ভালোবেসে আবার বাঁচিয়ে তুলি।

www.amaderchhuti.com

মেঘলা দিনে শুধু মনখারাপের খবরই পাচ্ছি – সদ্য প্রয়াত হলেন বাংলা ভ্রমণ পত্রিকার জনক এবং বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণপত্রিকা 'ভ্রমণবার্তা'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী প্রমোদাদিত্য মল্লিক। 'ভ্রমণ করুন, ভ্রমণের মাধ্যমে দেশকে দেখুন ও জানুন আর সঙ্গে রাখুন একটি পত্রিকা' -এই আদর্শ ছিল তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্তই। হুগলীর জুবিলি ব্রিজকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ নিয়ে বহরমপুরের সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধীর চৌধুরির সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় বৃষ্টিতে ভিজে অল্প কয়েকদিনের জ্বরে ২৭ জুন বহরমপুর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন ৭৭ বছরের এই তরুণ। তাঁর কথা বলতে গেলেই বারবার মনে পড়ছে 'আমাদের ছুটি'-র জন্য সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে অসাধারণ এই মানুষটির কাছে 'ভ্রমণবার্তা'-কে ঘিরে জীবনের যেসব অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম সেইসব। পূর্বসূরীকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

*"আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বেড়াতে গিয়ে খুব একটা লোকে অসুস্থ হয়না, সে যত গন্ডগোলই করুক।... আর অসুখবিসুখতো থাকবেই তবু সবারই উচিত যতটা সম্ভব বেড়ানো, সুস্থ থাকার জন্যই এটা খুব দরকার " - বেড়াতে গিয়ে অসুখ-বিসুখ হলে কী করা উচিত অথবা পথে বেড়িয়ে পড়ার আগে মেডিকেল কিটে কী কী রাখাটা দরকার এইসব জরুরি বিষয় নিয়ে - **এবারের কথোপকথনের আড্ডায় বসেছেন ডাক্তারবাবুরা।***

~ আরশিনগর ~

বনে বনে পথ চলা - মহম্মদ মহিউদ্দিন

গডউইনের সমাধির খোঁজে - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

www.amaderchhuti.com

~ সব পেয়েছির দেশ ~

ঈশ্বরের আপন দেশে – ঝুমা মুখার্জি

মুন্সিয়ারির কথা – অদিতি ভট্টাচার্য্য

~ ভুবনডাঙা ~

ঐতিহ্যের শহর ইস্তানবুলে – কাকলি সেনগুপ্ত

একটুকরো ব্রাসেলস – মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

~ শেষ পাতা ~

কোণার্কের সূর্যমন্দিরে – হুমায়ুন কবীর ঢালী

প্রকৃতির কাছাকাছি – রফিকুল ইসলাম সাগর

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

[বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে আবার অম্বল থেকে ডায়াবেটিস সবই তার নিত্য সঙ্গী। সেকালে অসুস্থতা আর বার্ধক্য নিয়েই সে ঘুরে বেড়িয়েছে তীর্থে তীর্থে, হেঁটেছে কেদার-বদরীর পথে। আর আজ শারীরিক অক্ষমতার বেড়া টপকে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীরে, পাহাড় চূড়ায়। বেড়াতে যাওয়ার সময় ব্যাগপত্র গোছাতে বসলে জরুরি তালিকায় যেটা থাকেই তা হল টুকটাক শরীর খারাপের জন্য চটজলদি কিছু ওষুধ। কিন্তু সেই তালিকায় কী নেব আর কী নেব না বা নিজের কোন শারীরিক অসুস্থতা থাকলে অন্য জায়গায় গিয়ে কতটা সাবধানে থাকব বা তেমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে সামাল দেব কীভাবে এমন নানান প্রশ্ন নিয়ে 'আমাদের ছুটি' এবার মুখোমুখি হয়েছে এমন কয়েকজন ডাক্তারদের সঙ্গে পেশার সফলতার পাশাপাশি যাঁদের সঙ্গী ভ্রমণের নেশা। আবার এই প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার সময়েই উত্তরাখণ্ডে নেমে এসেছে প্রবল দুর্যোগ। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি ভুক্তভোগী অসংখ্য পর্যটক। অনেক দুর্ভোগের শেষে যাঁরা বাড়ি ফিরতে পারলেন এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আতঙ্ক মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন কি? বড় প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের জবাব খুঁজলাম ডাক্তারদের পাশাপাশি মনোবিদের কাছেও।]

www.amaderchhuti.com

এবার কথোপকথনের আড্ডায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জেনেরাল মেডিসিন ও এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জি, অর্থোপেডিক ও স্পোর্টস মেডিসিনের ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জি, চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডঃ প্রিয়ঙ্কর পাল এবং মনোবিদ মোহিত রণদীপ।

◆ বেড়াতে ভালোবাসেন সকলেই, কিন্তু আজকের লাইফস্টাইলে নানারকম অসুখ-বিসুখও মানুষের নিত্যসঙ্গী। বেড়াতে বেরিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ এতো হাতের বাইরের ব্যাপার, কিন্তু নিজের সচেতনতা বা সাবধানতার অভাবও অনেকসময় ডেকে আনতে পারে বিপদ। কী করে বুঝব, কেমন করে এড়াব বা সামাল দেব এসব পরিস্থিতি?

. ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ কাদেরকে তুমি বেড়াতে যাওয়ার আগে নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে সচেতন হতে বলবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট - যার ডায়াবেটিস আছে, মেডিসিন খায় বা ইনসুলিন নেয়, পার্টিকুলারলি যারা ইনসুলিন নেয়। আবার যার হাইপারটেনসন আছে যেটা কনট্রোল্ড নয়, মাল্টিপিল মেডিসিনস খায়। কিংবা যার রিসেন্টলি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়েছে - রিসেন্টলি মানে উইদিন সিক্স মান্থস। যার অ্যাকটিভ কোন ইনফেকসন আছে বা যাদের মাস্কিউলোস্কেলিটাল প্রবলেম আছে অর্থাৎ ডিস্ক প্রোল্যাপ্স আছে, সিভিয়ার সারভাইকাল স্পনডোলাইসিস আছে, ভার্টাইগোর প্রবলেম আছে। এদের কখনও ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করাই উচিত নয়। সে পাহাড়েই যাক আর সমুদ্রেই যাক। তার কারণ হচ্ছে বেড়াতে গেলে মানুষেরতো লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়। নিজের রুটিনে চলা সম্ভব নয়। রুটিন ভাঙ্গলে কী এফেক্ট হতে পারে সেই সম্পর্কে তার জেনে রাখাটা খুব দরকার। সে কতটা নিয়ম ভাঙ্গতে পারে বা পারে না, তাকে কীভাবে চলতে হবে বা চলতে হবেনা এগুলো প্রত্যেকটা ব্যক্তি অনুযায়ী আলাদা করে বলে দেওয়া হয়। তবে এটাতো ঠিকই যে অত হিসেব করে কেউ বেড়ানো যায়না বা বেড়াতে যাওয়ার মানে হয়না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বেড়াতে গিয়ে লোকে সাধারণতঃ খুব একটা অসুস্থ হয়না, সে যত গন্ডগোলই করুক। নেহাত কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে অন্য ব্যাপার। যেসব অসুস্থতা হয় তা ওই পেট খারাপ, ঠান্ডা লাগা বা পড়ে গিয়ে পা মচকানো - এগুলো আনপ্রেডিক্টেবল। মেজর প্রবলেম যাদের হয়, সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের কিন্তু আগে থেকেই অসুস্থতা ছিল।

◆ □ যাঁরা নিয়মিত বেড়াতে যান তাঁদের ওষুধপত্রের কিটে কী কী ওষুধ আর ফার্স্ট এইড রাখাটা জরুরি? দলে ছোট বাচ্চা বা বয়স্ক মানুষ থাকলে এই তালিকায় আর কী যোগ হবে?

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ ওভারঅল একটা লোকের বেড়াতে যাওয়ার আগে যেটা করা উচিত, ওষুধ নিয়ে যাওয়া যদি বল, তা হল পরিচিত একজন ডাক্তারের থেকে কোন কোন ওষুধগুলো দরকার, তার বিভিন্ন ব্র্যান্ডনেম কী সেইসবের একটা তালিকা করে নেওয়া। সাধারণভাবে একটা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ যেন থাকে - জ্বর বা ব্যথা কমানোর জন্য। আইবুপ্রুফেন বলে একটা ব্যথার ওষুধ আছে, রিলেটিভিলি সেফ ওষুধ। বমির ওষুধ ডোমপেরিডন। একটা ডায়েরিয়ার ওষুধ রাখা উচিত। সাধারণত আমরা মেট্রোজিল বা টিনিডাজোল ব্যবহার করি। প্যারাসিটামল দিনে চারবার পর্যন্ত খাওয়া যায়। আইবুপ্রুফেন দুবার খেতে পার। টিনিডাজোল দিনে দুবার করে খাওয়া উচিত। লোমোটিল বলে একটা ওষুধ পাওয়া যায়। এটা চট করে লুজ মোশন কনট্রোল করে। রাস্তায়-ঘাটে চলতে অনেক সময় দরকার হয়। ওষুধের তালিকায় একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক থাকা উচিত। অ্যাভিল জাতীয় ট্যাবলেট বা সেট্রিজিন, লিভোসেট্রিজিন। কারোর কারোর পাহাড়ের বাঁকে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, গাড়িতে উঠলে মাথা ঘোরে - এরজন্য সবচেয়ে ভাল ওষুধ স্টুজিল। অনেকক্ষণের ট্যুর হলে বেড়ানোর আধঘন্টা আগে ও আধঘন্টা পরে একটা করে মোট দুটো ট্যাবলেট খেতে পার তাহলে মাথাঘোরাটা থাকবেনা। প্রয়োজনে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে তিনবারও এই ওষুধটি খেতে পারবেন। কিছু লোকের ট্রেনে-বাসে উঠলেও মাথা ঘোরে, তারাও কিন্তু খেতে পারে। সম্ভব হলে ব্রডস্পেকট্রাম একটা অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কোন ডাক্তারের থেকে জেনে নিয়ে সঙ্গে রাখা ভাল।

আমি যেগুলো বললাম সবকটাই বড়-ছোট সবাইকেই দেওয়া যায়। ছোটদের জন্য বয়স অনুসারে, বডিওয়েট অনুসারে ডোজ কম।

এছাড়া কিছু ব্যান্ড এইড, কিছু লোকাল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম এগুলো রাখা উচিত। বাচ্চাদের জন্য স্পেসিফিকালি কিছু বলে রাখি - ওদের অনেকসময় পাহাড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগে। ওদের ন্যাজাল ড্রপ, কাফ সিরাপ, অ্যান্টিবায়োটিক সঙ্গে নেবেন। এছাড়া ছোট বাচ্চা উল্টোপাল্টা খেয়ে নেয়, পেটে ব্যথা হয়, তার ওষুধ। বাচ্চাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই ওষুধ থাকে, সেই প্যাকটা যেন বাড়ির লোক বেড়ানোর সময় সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

যেসব পেশেন্টের ডায়াবেটিস, হাইপারটেনসন, হার্টের অসুখ আছে তারা নিয়মিত যে ওষুধ খান সেসবতো নিয়ে যাবেনই। এদের জন্য আবার কিছু সাবধানতা, নিয়মকানুন মানাও প্রয়োজন। এরা সমতলে যেকোন জায়গায় বেড়াতেই পারেন, যদিনা ডাক্তার তাকে স্পেসিফিকালি বারণ করে থাকে। যেমন ধরো, সুগার যদি আড়াইশো-তিনশোর ওপরে থাকে তাহলে আমরা তাকে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে বারণই করি। ১৪০-৯০ বা তার বেশি প্রেশার থাকলে, তা

ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জি

খানিক না কমা অবধি হাঁটাচলা বেশি না করাই ভাল, নাহলে হার্টের ওপর চাপ পড়তে পারে। কারোর যদি হাঁটলে বুকে ব্যথা করে তাহলে কারণটা খুঁজে বার করে চিকিৎসা করে তবেই বেরোনো উচিত। হার্টের পেশেন্টদের নিজেদের ওষুধ ছাড়াও হাতের কাছে সবসময় সরবিট্রেট রাখতে হবে। চেস্টপেইন হলে ইমিডিয়েটলি জিভের তলায় একটা, পাঁচমিনিট পরে একটা, আবার পাঁচমিনিট পরে একটা এভাবে দু'তিনটে দিতে পারে। যদি ব্যথা কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা হার্টের ব্যথা। আর যদি তিনটে খাওয়ার পরও ব্যথা না কমে আরও বাড়ছে, আরও কষ্ট হচ্ছে তাহলে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের হেল্প দরকার।

□ ডঃ প্রিয়ঙ্কর পালঃ বাচ্চাদের জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, মাথা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল, বমি, পেটখারাপের জন্য ওন্ডানসেট্রন, ডায়েরিয়া হলে ও আর এস, পেট ব্যথা হলে ড্রোটিন, কেটে ছড়ে গেলে অ্যান্টিসেপ্টিক মলম বা ব্যান্ড এইড সঙ্গে রাখবেন। বাচ্চার অ্যাজমার সমস্যা থাকলে ইনহেলার নিতে ভুলবেন না। হাই অলটিচ্যুডে কারো কারো মাথাব্যথা হয়, সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। এমনিতে বাচ্চারা ভালোই মানিয়ে নিতে পারে। বাচ্চা নিয়মিত কোন ওষুধ খেলে সেগুলোও নিতে ভুলবেন না।

□ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জিঃ যে কোন বেড়ানোর ক্ষেত্রেই মাথা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল, গা-বমি ভাবের জন্য ডোমপেরিডন ছাড়া হাঁটু-কোমর ব্যথার জন্য ব্রুফেন, অ্যাসিডিটির জন্য ওমেপ্রাজল ইত্যাদি সাধারণ ওষুধগুলি সঙ্গে রাখা ভালো। তাছাড়া নিজের প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সেই বাবদ ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন।

◆ কোথায় যাচ্ছি - পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল, চেনা শহর বা অচেনা পথে ট্রেকিং-এ তার ওপরেওতো ওষুধের তালিকার হেরফের হবে। লাদাখ বেড়াতে গেলে যা নেব নিশ্চয় আন্দামান বেড়াতে গেলে অন্য হবে। হাই অল্টিচ্যুডে অনেকসময়েই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। তেমন পরিস্থিতি হলে কী করব? ভিতরকণিকার মতো ওড়িশার কিছু কিছু অরণ্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে শুনেছি। সেসব জায়গায় যেতে হলেই বা কী সাবধানতা নেব?

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ সমতলে বেড়ানোর ক্ষেত্রে সবজায়গার জন্যই ওষুধপত্র বা সাবধানতার ব্যাপারটা মোটামুটি একইরকম। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত জায়গায় যেতে হলে ক্লোরোকুইন জাতীয় ওষুধের একটা কোর্স করতে হয়। স্টার্ট করতে হয় দু'সপ্তাহ আগে এবং ফিরে আসার দু'সপ্তাহ পরে বন্ধ করে দেওয়া যায়। বেড়াতে যাওয়ার আগে কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেই কোর্স করে নেওয়া উচিত। কারণ কারো কারো এই ওষুধে অ্যালার্জি হয়।

ডঃ প্রিয়ঙ্কর পাল

হাই অল্টিচ্যুডে সমস্যা হয় অক্সিজেনের জন্য। প্লেন ল্যান্ডে অক্সিজেনের যে প্রেশার আর কনসেনট্রেশন সেটা খুব জরুরি আমাদের লাংসে অক্সিজেন ট্রান্সফারের জন্য। অক্সিজেনের চাপ খুব কমে গেলে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন রক্তে ঢুকবেনা। যত হাই অল্টিচ্যুডে উঠবে তত অক্সিজেনের চাপ কমে যাবে। ফলে শরীরে অক্সিজেনের আদানপ্রদান কম হবে। আর অক্সিজেন কম হলেই শরীরে সমস্যা দেখা দেবে।

হাই অল্টিচ্যুডকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম হাই অল্টিচ্যুড হচ্ছে ৫০০০-১০০০০ ফিট। এই উচ্চতায় খুব একটা সমস্যা হয়না যদিনা তোমার নিজস্ব কোন শারীরিক জটিলতা থাকে। তারপরে ১০০০০-১৮০০০ ফিট - ভেরি হাই অল্টিচ্যুড। আর ১৮০০০-এর ওপরে হচ্ছে এক্সট্রিমলি হাই অল্টিচ্যুড। ১৮০০০ হাজারের ওপর গেলে তাকে প্রিপারেশন, পারমিশন, মেডিকাল চেক আপ নিয়ে যেতে হয়। লাদাখে প্যাংগং লেক আর খারদুং লা দুটোই ওয়ার্ল্ডের দুটো হায়েস্ট মোটরেবল রোডে। দুটোতেই খুব শ্বাসকষ্ট হয়। লে ১০-১২০০০ ফিট আর খারদুং লা ১৮০০০-এর কিছু বেশি। যেখান থেকে পেরিয়ে তুমি নুব্রা ভ্যালিতে ঢুকছ। লে থেকে জিপে খারদুং লা উঠতে লাগে ৪৫-৫০ মিনিট। ১০০০০-১৮০০০ হাজারের মধ্যে তোমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়। কী করতে হয় - স্লো রাইজ। ধীরে ধীরে ওঠ। প্লেনে করে সরাসরি না যাওয়াই ভাল। শ্রীনগর দিয়ে বাসে এসো কী মানালি দিয়ে বাসে যাও, দেখবে ওতেই অ্যাডাপ্টেশন হয়ে গেছে। আর সোজা দিল্লি থেকে লে-তে নাম তাহলে দুদিন চুপ করে বসে থাক। অ্যাডাপ্ট কর। কারণ তোমার শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি কমানোর জন্য কিছু পরিবর্তন হবে। পরিবর্তনটা করতে দিলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ১৮০০০-এর অনেক ওপরতো সাধারণ লোক যায়না, তাকে ক্লাইম্বার হতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে।

হাই অল্টিচ্যুডে সেরিব্রাল ইডিমা, পালমোনারি ইডিমা হতে পারে। ব্রেনে বা লাংসে জল জমে যায়। এরকম বিপদ হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়ে আনতে হবে। বা হাইপারবেটিক অক্সিজেন থেরাপি করতে হবে। লে-তে আর্মি হেল্প করে ভীষণ। আর্মি হসপিটাল আছে, ডাক্তার আছে, অক্সিজেন টেন্ট সব আছে। হোটেলের লোকজনও সাহায্য করবে। তবে লে গেলে আগে থেকে প্ল্যান করে যাওয়া ভাল। সুগার, প্রেসার, হার্টের প্রবলেম, স্পাইনাল কর্ডের প্রবলেম, যাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় বা অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিসের মত লাংসের অসুখ আছে তাদের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে যাওয়া উচিত।

□ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জিঃ হাই অল্টিচ্যুডে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় সাধারণতঃ বিশেষ অসুবিধা হয়না। তার ওপরে উঠলে মাথা ব্যথা, শ্বাস কষ্ট, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, ক্ষুধাহীনতা, খিটখিটে ভাব ইত্যাদি হতে পারে। এসবই উচ্চতা জনিত রোগ বা হাই অল্টিচ্যুড সিকনেস। এরকম হলে চলাফেরা কম করুন। বারে বারে চা, স্যুপ ইত্যাদি গরম কিছু খান। মাথা ব্যথায় প্যারাসিটামল ৬৫০ মিলিগ্রাম দিনে তিন বা চার বার খান। গা বমি করলে ডোমপেরিডন জাতীয় ওষুধ (খালিপেটে এক বা দু'বার) খান। মদিরা সেবন অত্যন্ত অনুচিত।

◆ নানাসময়েই, বিশেষতঃ পাহাড়ে বেড়ানোর ক্ষেত্রে অনেকসময়েই পানীয় জল পেটের পক্ষে ভালো হয় না। এসবক্ষেত্রে জিওলিন ব্যবহার করাই ভাল নাকি মিনারেল ওয়াটার কিনে খাব? বাজার চলতি মিনারেল ওয়াটারগুলোও নিরাপদ তো?

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ নিজের জল নিজে ক্যারি করা ভাল। জিওলিন ব্যবহার করতে পার। দেখবে জিওলিনের মাত্রা দেওয়া থাকে। এক লিটার জলে আট-দশ ফোঁটা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয়, নইলে ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে না। আর মিনারেল ওয়াটার কিনেতো খেতেই পারো। ব্র্যান্ডেডগুলোর ওপর নির্ভর করা যায়। ভারতের সর্বত্রই খাবারে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, তারপর ডায়েরিয়া করে এমন প্রোটোজোয়া পাওয়া যায়, ইট হ্যাজ বিন প্রুভেন বাই টেস্টস। তবে খাবারের থেকেও বেশি রোগ ছড়ায় জল দিয়ে। তাই জল কিনে খাওয়াটাই সবচেয়ে ভাল। আবার অনেকসময় আমরা ভুল করে ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে নিই। খাওয়া উচিত গরম ফুটন্ত খাবার। তুমি একটা চাওমিন খাবে,কী অন্যকিছু খাবে, সামনে বানাতে বলবে, ভেজে দিতে বলবে। ওই টেম্পারেচারে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মরে যায়। আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে পার, বেড়িয়ে বা পেশেন্টদের দেখে যে রাইস-বেসড খাবারগুলো - ফ্রায়েডরাইস, বিরিয়ানি, পোলাও - সবচেয়ে বেশি ডায়েরিয়া করে। কারণ অনেকসময় রাইসগুলো রেখে দেয় ওরা, পরে মিক্স করে। সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড

www.amaderchhuti.com

ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জি

দিজ থিংস। বাইরে বেড়াতে গিয়ে ফ্রায়েডরাইস খাওয়া, বিরিয়ানি খাওয়া এসব অ্যাভয়েড করাই ভাল। আনলেস সেটা একটা ওয়েল নোন বা ডকুমেন্টেড জায়গা।

আর সবসময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্যারি করবে। পার্টিকুলারলি ফর চিলড্রেন। কারণ বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, প্লেনে কোথায় হাত দিচ্ছে। রেসপিরেটারি ইনফেকশন, জি আই ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সবকিছুই হাত দিয়েই হয়। যখনই খাবে তার আগে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

◆ কোমরে, পিঠে স্পন্ডাইলোসিস, এওতো এখন কর্পোরেট চাকুরেদের নিত্য সঙ্গী। তাই বলে কি পাহাড়ে ছোটখাটো ট্রেকিং-ও করা যাবে না? যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন না, তাঁরা যদি ট্রেকিং-এ যেতে চান তাহলে কী ধরণের ব্যায়াম বা শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার?

□ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জিঃ স্পন্ডাইলোসিস থাকলে ছোটখাটো ট্রেকিং করতে কোন বাধা নেই - তবে ভারি কিছু বহন না করাই ভাল। ট্রেকিং করার অর্থ পাহাড়ে হাঁটা। সুতরাং ট্রেক করতে গেলে হাঁটা অভ্যাস করতে হবে। প্রাতঃভ্রমণ দিয়ে শুরু করতে পারেন। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটার পরিমাণ বাড়ান। স্নিকার জাতীয় ভাল, আরামদায়ক জুতো অত্যন্ত প্রয়োজন।

□ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ স্পন্ডাইলোসিস থাকলে ট্রেকিং করতে এমনিতে কোন অসুবিধা নেই। খুব সাংঘাতিক ট্রেকিং নয় অবশ্য - সেসবতো প্রফেসনাল ট্রেকারদের জন্য। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাকটিভলি কোন পেন না থাকে, বা ভার্টাইগো না থাকে। তাহলে কিন্তু যেতে পারবেনা। উচিত হল আগে একটু এক্সসারসাইজ করে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেওয়া। আমরা সবসময় বলি কোন লোক ট্রেকিং করতে গেলে তার কিন্তু কোন রোগ থাকা উচিত না। ট্রেকিং ইজ সামথিং ফর এ ফিট পারসন। কারো যদি স্কেলিটাল প্রবলেম থাকে - সিভিয়ার স্পনডাইলোসিস লাম্বার বা সারভাইকাল তাহলে সে কিন্তু যেতে পারবেনা।

প্রত্যেকটা লোকের বেরোনোর আগে অন্তত সিক্স উইকস ট্রেন করা দরকার। মডারেট স্পিডে ওয়াকিং, একটুখানি জগিং, রানিং, সুইমিং - করে দেখে নেওয়া যে আমি পারছি কীনা। ট্রেকিং তো ভীষণ স্ট্রেনাস জব।

◆ অনেকেরই হার্টের নানান সমস্যা থাকে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হলে বা পেসমেকার বসানো থাকলে কী কী সাবধানতা নেওয়াটা জরুরি? হাই অল্টিচ্যুডে যাওয়া যাবে কি?

□ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ স্টেন্ট বা পেসমেকার থাকলে প্লেন ল্যান্ডে আলাদা বিশেষ সাবধানতার দরকার লাগেনা। তবে হাই অল্টিচ্যুডে যেতে হলে বা পাহাড়ে হাঁটতে হলে অবশ্যই ডাক্তারকে জানাতে হবে যে সে আদৌ সেটা পারবে কীনা। বিকজ দেয়ার হার্ট ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি। ওইজন্যইতো বাইরে থেকে স্টেন্ট বসান হয়েছে বা পেসমেকার। সে এখন যদি লে-তে পৌঁছায়, সেখানে অক্সিজেন কম। আরও প্রেশার পড়বে হার্টের ওপর। তাই অবশ্য এদেরকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে, ইকোতে কী ফাইন্ডিংস আছে, কটা ব্লক আছে। তুমি যদি বাঁধা গতে বল এরা লাদাখ যেতে পারবে কীনা, আমি বলব - না। যদি বল পুরী যাবে - নো প্রবলেম।

◆ এখন আমাদের মধ্যে একটা খুব চেনা অসুখ ডায়াবেটিস যাতে খাওয়াদাওয়ার নানান বাধানিষেধ থাকে। বেড়াতে গিয়ে এত নিয়ম মেনে চলব কী করে? তেমন অফবিট জায়গা হলেতো ইচ্ছেমতো খাবারও মিলবে না।

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ যাদের ক্ষেত্রে ডায়েটটা একটা বড় ব্যাপার যেমন ডায়াবেটিস, তারা যেন সেটা নিয়ে কম্প্রোমাইজ না করে। যদি মনে কর খাওয়াদাওয়া কনট্রোল করতে পারবেনা, তাহলে তেমন জায়গায় তুমি যাবেনা। আর ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে বড় চিন্তার হল হাইপোগ্লাইসেমিয়া - হঠাৎ সুগার লেভেল কমে যাওয়া। বেরোনোর আগে তার খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত যেন সে নিজে করে রাখে। সঙ্গে নিজের পানীয় জল থাকবে। অ্যাটলিস্ট কিছু স্ন্যাকস থাকবে, আমরা বিস্কিট নিয়ে যেতে বলি। ধরো তুমি ব্রেকফাস্ট পেলেনা। কিন্তু তোমাকে সুগারের ওষুধ খেতে হবে। তুমি যদি চারটে কী পাঁচটা ক্রিমকেকার বিস্কিট খাও সেটা গুড এনাফ ক্যালরি ফর এ ব্রেকফাস্ট। তুমি লাঞ্চ পেলেনা। তখন একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট তো বসে থাকবেনা বা যা পাবে তাই খাবে না, তোমার কাছে যদি একটা বিস্কুটের প্যাকেট থাকে, তুমি যদি আটটা ক্রিমকেকার বিস্কুট খাও, ইট ইজ কোয়াইট এ গুড ক্যালরি ফর লাঞ্চ। বা তোমার কাছে যদি ব্রেড থাকে বা স্যান্ডুইচ বানিয়ে নিয়ে গেলে তাই খাও অর্থাৎ ডায়াবেটিক পেশেন্টকে নিজের মত করে একটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। এছাড়া মুড়ি, চিঁড়েভাজা, ছোলাভাজা নিয়ে যেতে পারে। বেড়াতে গিয়ে সেখানে কী পাওয়া যাচ্ছে তার ওপরে কোনদিন ডিপেন্ড করবেনা। তুমি যদি হোটেলে খেতে যাও, ভাত-রুটি পেতে পার, ডাল পেতে পার। সমস্যা নেই, তুমি জান কতটা খেতে হবে। বেশিরভাগ জায়গায় যে মসলাদার সবজি হয় সেটা ডায়াবেটিক পেশেন্টদের খাওয়ার জন্য নয়। সবজির মধ্যে থেকে গ্রেভিটা বাদ দিয়ে দাও। মাছ, চিকেনতো পাওয়াই যায়, প্রবলেম করে গ্রেভিটা, বাদ দিয়ে দাও। তোমার মত ৫০-৬০ গ্রাম চিকেন বা মাছ তুলে খেয়ে নাও। সাউথ ইন্ডিয়ায় গেলে তুমি টক দই পাবে। ৭৫ গ্রাম কী ১০০ গ্রাম টক দই খেয়ে নাও। এইভাবে মডিফিকেশন করতে হবে। তুমি দেখলে রুটিও পাওয়া যাচ্ছে, পরোটাও পাওয়া যাচ্ছে, আজকেতো পরোটা খেয়ে নিই, এই ধরণের মানসিকতা থাকলে হবেনা। ওর মধ্যে থেকেই তোমাকে বেছে নিতে হবে যে আমার কোনটা। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আমার যেটা মনে হয়েছে সব জায়গায় সব কিছু পাওয়া যায়। আমাদের যদি অ্যাটিটিউডটা ঠিক থাকে তাহলে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অ্যাক্সিডেন্টালি তুমি কোথাও গিয়ে পৌঁছালে যেখানে তখন খাবার পাওয়া যাচ্ছেনা, সেটা অন্য সিচুয়েশন, সেটাতো তোমার-আমার হাতে নেই। কিন্তু রুটিন ট্যুরের ক্ষেত্রে তোমার যদি খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোন রেস্ট্রিকসন থাকে সেটা মেনে না চলার কোন ব্যাপার আমি দেখিনা।

আর কিছু পরিমাণ গ্লুকোজ ক্যারি করা ম্যান্ডেটারি। পারটিকুলারলি ফর দোজ হু আর অন মেডিসিনস। যারা ওষুধ খায় না তাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার চান্স খুব কম। বেড়াতে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার একটা চান্স থাকে এই কারণে যে তখন ফিজিকাল অ্যাক্টিভিটি অনেকটা বেড়ে যায়, কেউ যদি খাবারটাকে উইদিন কনট্রোলে রাখে, অ্যাক্টিভিটি বাড়ার জন্য সুগার লেভেল ড্রপ করে। যে কোনদিন পাড়াতেও হাঁটে না, সে গেল বৈষ্ণোদেবী। সে যদি সকালে তিনশ সুগার নিয়েও স্টার্ট করে, অতটা এক্সসারসাইজ করার পর অবভিয়াসলি সুগার ড্রপ করবে। ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হার্টের ডিজিজ কী হাইপারটেনসন - এদের ক্ষেত্রে হিরোইজমের কোন জায়গা নেই। খুব বেশি এক্সসারসাইজ হলে প্রেশার বেড়ে যাবে, সুগার কমে যাবে, যার অ্যানজাইনা আছে, করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, তার বুকে ব্যথা হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আবার অন্য প্রবলেম হয়। তুমি ইস্টে গেলে বা ওয়েস্টে গেলে তোমার টাইম জোন পালটাবে, তুমি ওষুধ কখন খাবে? কখন ইনসুলিন নেবে? তুমিতো এখানে ব্রেকফাস্টের আগে সকাল ন'টার সময় নাও ওখানে কটা বাজে তখন? ওখানে পৌঁছে পরেরটা কটার সময় নেবে? তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে দেখতে হবে। ইস্টে গেলে অ্যাড করবে আর ওয়েস্টে গেলে মাইনাস করবে।

◆বিদেশে বেড়ানোও এখন খুব সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু বিপদের দিনে সবসময় হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া নাও যেতে পারে। হঠাৎ করে কোন এমার্জেন্সি সিচুয়েসন তৈরি হলে কী করব? শহর বা তার কাছাকাছি থাকলেতো একরকম। রিমোট কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে কি এব্যাপারে কিছু সাবধানতা নেওয়ার দরকার আছে? এমন পরিস্থিতি দেশে-বিদেশে যেখানেই ঘটুক না কেন কী করা উচিত?

□ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জিঃ বিদেশে বেড়াতে গেলে মেডিকাল ইনসিওরেন্স অবশ্যকর্ত্তব্য। এছাড়া ট্রাভেল এজেন্টদের কাছ থেকে আপৎকালীন ফোন নাম্বার সঙ্গে রাখুন।

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ অসুস্থতার ব্যাপারতো একই। বাইরের দেশে যেটা মুশকিল হয় অন্য ভাষা, তাদের বোঝানো। ওদের হেলথ সিস্টেমও আমাদের থেকে আলাদা হয়। এটাও আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি। চায়নায় গিয়ে লোককে বোঝানো ডিফিকাল্ট যে তোমার কী প্রবলেম হয়েছে। ইস্তানবুলে গিয়ে একজন অসুস্থ হয়েছে, তার প্রবলেম বোঝাতে গিয়ে আমার ঘাম ছুটে গেছে। দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ। তাদেরকে বোঝানোই যাচ্ছেনা যে এর কী প্রবলেম হয়েছে। আমি বললাম যে আমি নিজেই ডাক্তার, আমি বলেই দিচ্ছি যে কী হবে, কমিউনিকেটই করতে পারলামনা। উড়িয়ে নিয়ে আসতে হল বোম্বেতে, তারপরে তার প্রাণ বাঁচল। যেখানে যাচ্ছ, সঙ্গে বা সেখানে যেন এমন লোক থাকে যে স্থানীয় ভাষা বোঝে। যে সিটিতে যাবে সেখানে নিজেদের এম্ব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখবে, নাম্বার নিয়ে রাখবে। বাইরে গেলে এম্ব্যাসির লোক ভীষণ হেল্প করে। ওদের হেল্প ছাড়া বিদেশে মেজর কোন অসুস্থতায় পড়লে অসুবিধায় পড়বে। আর ইনসিওরেন্স ছাড়া এখনতো অধিকাংশ দেশে ঢুকতেই দেয়না, তা তুমি কোন ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গেই যাও বা নিজে। সবসময় ইনসিওরেন্স করে যাবে। বিদেশে বেড়াতে গেলে এই তিনটে জিনিষ অবশ্যই মাথায় রাখবে।

বিদেশে তুমি কোথাও পৌঁছেই জেনে যাবে কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায় আছে, বা কোথায় কী আছে। আর যে গাইড সঙ্গে থাকবে, সে এগুলো সবসময় জানবে। এমনকী কে কোন স্পেশালিস্ট, কোন হসপিটালের সেটাও। আমি যখন জর্ডনে গেছি, ইস্তানবুলে গেছি ওরাই কিন্তু হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল।

www.anandalokhuti.com

আমাদের দেশে এটা হয়না। আরেকটা জিনিষ বাইরে গেলে হয় ওরা তোমাকে এমন জায়গায় ঢুকতে দেবেনা, যেখানে তুমি অসুস্থ হয়ে পরলে হেল্প পাবেনা। আমাদের দেশে এসব দেখবেনা। লাচেনে ৬৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোন ওষুধের দোকান নেই। লোকে যাচ্ছে বেড়াতে। অনেক দেশে যেতেই দিতনা। এইগুলোতো পার্টিকুলার জায়গার স্পেসিফিক প্রবলেম, ইউ কান্ট ডু এনিথিং। তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে যে কে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তাকে নিয়ে যাবনা। গুরুদোংমার লেকে গিয়ে যেমন আমার ছেলেকে ঢুকতে দিলনা। আট বছরের নীচে আর ষাট বছরের ওপরে গুরুদোংমারে ঢুকতে দেয়না। আমার ছেলের তখন সাত বছর বয়স। আমি ছেলেকে নিয়ে থাকলাম, আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ঘুরে এল। আগেরদিনই ওখানে একটি লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, পাঁচটা বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অ্যারাউন্ড সেভেনটিন থাউজেন্ড ফিট, অক্সিজেন এত কম, আমারই অস্বস্তি করছিল। অথচ লোকে কী করছে, বয়স লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এতে লাভ কী অসুস্থ হয়ে পড়ে? কারোর বয়স সত্তর বছর, সে বলল পঞ্চান্ন, মিলিটারিতো তোমার বয়স মাপতে যাবেনা। তোমাকে নিজেকেই বুঝতে হবে আমি কোথায় যাব আর কোথায় যাবনা।

◆ উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে বেঁচে ফিরলেন যেসব পর্যটকেরা, বিশেষ করে শিশু বা অল্পবয়সী তাদের নানারকম শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি একটা মানসিক ট্রমা দেখা দিতে পারে। কীভাবে এইসব শারীরিক-মানসিক সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে?

মোহিত রণদীপ

□ মোহিত রণদীপঃ এই ধরণের কোন বিপর্যয়ের একটা প্রতিক্রিয়া মনের ওপর পড়ে। একেকজনের ক্ষেত্রে তার রেসপন্সটা একেকরকম হয়। কারোর ক্ষেত্রে একটা নিরাপত্তাবোধের অভাব কাজ করে - হতবাক হয়ে যায়, কথা বলতে চায়না, একদম চুপ করে যায়। এদের মধ্যে ডিপ্রেশনের মাত্রা বেড়ে যায়। এরা একটুতেই আতঙ্কিতবোধ করে, কোন শব্দ শুনলেই চমকে ওঠে, আকাশে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে যায়। অর্থাৎ যে অনুসঙ্গগুলোর সঙ্গে ওই স্মৃতির যোগ দেখা যায় কোথাও তাতেই মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়। কারোর মধ্যে আবার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এসবের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।

এই পোস্ট-ট্রমাটিক স্টেজ অনেকে ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে পারেন। কারোর কারোর মধ্যে এটা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। ছোট-বড় সকলেই এই ধরণের ঘটনায় অ্যাফেক্টেড হয়। মনের মধ্যে এই যে অনুভূতিগুলো জমা হয় সেটা চেপে না রেখে এক্সপ্রেস করতে পারলে এই ট্রমাগুলো ক্রমশ কমে আসতে থাকে। যেকোন নেগেটিভ ফিলিং যখন আমরা মনের মধ্যে জমিয়ে রাখি, অবদমন করি, পরবর্তীকালে সেটা নানান অসুবিধার আকারে প্রকাশ পায় - কখনও তা মানসিক অসুস্থতার চেহারা নিয়ে, কখনওবা নানান শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ নিয়ে। যে অনুভূতিগুলো বিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেটা যত সে প্রকাশ করতে পারবে তত সেই অনুভূতির জন্য মনের মধ্যে জমে থাকা চাপ হালকা হবে। ধীরে ধীরে লক্ষণগুলো কমতে শুরু করবে। প্রকাশের মাধ্যম নানাকিছুই হতে পারে - কখনও কথা বলে হতে পারে, কখনও লিখে হতে পারে, বা কোন সৃজনশীল মাধ্যম সে ছবি হোক বা কবিতা হোক, হতে পারে। ছোটদের ক্ষেত্রে সৃজনশীল মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হয় - খেলা, ছবি আঁকা, ক্লে মডেলিং। ওই অনুসঙ্গগুলোকে এসবের মাধ্যমে প্রকাশ করা। হয়তো বিপর্যয়ের কোন ঘটনা নিয়ে সে ছবি আঁকল, তারপর তাকে ছবির বিষয়টা বলতে দেওয়া।

www.anaderchhuti.com

আরেকটা কথা, আমরা পাশে আছি আর যে ঘটনা ঘটে গেছে এখানে তার আবার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই -কাছের লোকজনকে এই অ্যাসিওরেন্সটা দিতে হবে। কারো কারো ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবোধের অভাব যদি খুব বেশি থাকে, অ্যাংজাইটি বেশি থাকে তখন ঘুম আসতে চায়না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে অ্যাংজাইটিতো থাকেই, তার সঙ্গে ডিপ্রেশনেরও অনেক লক্ষণ দেখা যায়। ডিপ্রেশনের মাত্রা বেশি থাকলে ঘুম মাঝরাতে বা ভোররাতে ভেঙ্গে যায়, মনে অদ্ভুত একটা শূন্যতার বোধ তৈরি হয়। যদি মনে হয় যে মনখারাপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বা বিষন্নতার মাত্রা খুব বেশি যা প্রতিদিনের জীবনকে, ঘুম খিদে এসবকে প্রভাবিত করছে তাহলে অবশ্যই কোন চিকিৎসক অর্থাৎ সাইক্রিয়াটিস্টের পরামর্শ নিতে হবে।

□ ডঃ প্রিয়ঙ্কর পালঃ সাম্প্রতিককালে উত্তরাখন্ডের বিপর্যয়ে যেসব শিশু বা ছোট ছেলেমেয়েরা বিপদগ্রস্ত, অসুস্থ হয়েছে তাদের শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি এখন মানসিক সহায়তা দেওয়াটা খুব জরুরি। সে বাবা-মা, নিকট আত্মীয়-স্বজন হোক বা যাদের পরিবারের কারোর সন্ধান পাওয়া যায়নি তাদের ক্ষেত্রে যাঁরা দেখভাল করছেন তাঁদেরকেই এই কাজ আন্তরিকভাবে করতে হবে। তাহলেই সময় লাগলেও বাচ্চারা এই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

◆ আপনিতো নিজেও বেড়াতে খুব ভালোবাসেন। কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছেন? বেড়াতে বেরোলে কি নিজেই ডাক্তার এটা বাড়তি একটা সুবিধা বলে মনে হয়? তেমন কোন পরিস্থিতিতে কখনও পড়েছেন কি?

□ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জিঃ নিজে ডাক্তার হলে অবশ্যই নিজের এবং পরিবারের জন্য অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকা যায়। কিছু ক্ষেত্রে নিজের ছোট বাচ্চাকে নিয়েও ঝুঁকি নিতে পেরেছি - দেড় বছরের বাচ্চাকে নিয়ে কেদারে হেঁটেছি।

বেড়াতে গিয়ে অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে - তবে সব থেকে মনে পড়ে ১৯৮৪ সালে নেতারহাটের পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের কথা। আমি তখন ডাক্তারির ছাত্র। আহতদের তত্ত্বাবধান করে যে আনন্দ আর সম্মান পেয়েছি তা কোন দিনই ভুলব না।

□ ডঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জিঃ প্রায় পনের বছর আগের কথা। ডাক্তার-স্টুডেন্টদের একটা বড় গ্রুপে আমরা হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গেছিলাম। যাওয়ার সময় হিমগিরিতে ডাকাতি হয়েছিল। ট্যুরিস্টদের একটা গ্রুপ যাচ্ছিল কলকাতা থেকে ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে। সেই গ্রুপের কয়েকজন লোক ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইতে আহত হয়েছিল। একজনেরতো পায়ে বিরাট ইনজুরি হয়েছিল। আমরা চারপাঁচজন মিলে তার চিকিৎসা করেছিলাম। আর একবার ট্রেনে একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । চেস্ট পেইন হচ্ছিল। আমার কাছে সরবিট্রেট ছিল, খাইয়ে পরের স্টেশনে নামিয়েছিলাম। প্লেনে একবার একজনের খুব ভার্টাইগোর প্রবলেম হয়েছিল, তাকে অ্যাটেন্ড করেছিলাম।

নিজের ফ্যামিলি বা বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাতো হয়ই। অন্যে ভরসা পায় আমি সঙ্গে গেলে (হাসি)। আর কাউকে কিছু চিন্তা করতে হয়নাতো। আমি হিসেব করে সব ওষুধপত্র নিয়ে যাই। সঙ্গে বাচ্চা গেলে বাচ্চার যে ওষুধের বক্সটা আছে সেটাও নিয়ে নিই। আর কোথাও গেলে সবসময় খোঁজখবর করে যাই ওখানে হসপিটাল কোথায় আছে, পুলিস কোথায় আছে। বাইরে গেলে এমব্যাসির খোঁজ করে রাখি, ইনসিওরেন্স করে রাখি।

বাচ্চাদের অসুস্থতা সবথেকে কম হয়। বয়স্ক বা অসুস্থদের সমস্যা বেশি হয়। যারা পরিবার নিয়ে যান তাদের উচিত পড়াশোনা করে, প্ল্যান করে যাওয়া । আমি প্রায় সারা ভারতবর্ষ একাধিকবার ঘুরেছি। তেমন কোন প্রবলেম হয়নি। লাচুং-লাচেনে যেতে খাবারই পাবেননা ঘন্টার পর ঘন্টা। ওখানে জলও তেমন পাওয়া যায়না। আমরা খাবার, জল সব শিলিগুড়ি থেকেই নিয়ে গেছি। আর অসুখবিসুখতো থাকবেই তবু সবারই উচিত যতটা সম্ভব বেড়ানো, সুস্থ থাকার জন্যই এটা খুব দরকার।

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

প্যাংগং লেকের তীরে ডাঃ পুরুষোত্তম চ্যাটার্জি

Rate This : - select -
Total Votes : 8
Average : 4.38

Like 3 people like this. Be the first of your friends. tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বনে বনে পথ চলা

মহম্মদ মহিউদ্দিন

~ তথ্য - কালেঙ্গা অভয়ারণ্য ~

একটু দূরে গাছের ডালে বসে থাকা মাছরাঙ্গা পাখি দেখছি আর মন ভরে ছবি তুলছি। একটু শব্দ হলেই বোধহয় উড়ে যাবে। তাই সবাই নিঃশব্দেই দেখছিলাম, হঠাৎ এক রকম জোরালো আমন্ত্রণেই আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে আনল একদল মুখপোড়া হনুমান। নীরবতা যেন তাদের একটুও পছন্দ না। ঠিক মাথার উপর বসে থাকলেও আমরা ওদের দেখছি না, তাই হয়তো এমন ডাকাডাকি। এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে, ঝুলে দুটি হনুমান তো রীতিমত কসরত দেখাতে দেখাতে গাছ থেকে পড়েই যাচ্ছিল। তাদের দলের একটি মা তার বাচ্চাকে নিয়ে চুপচাপ বসে এই খেলা দেখছিল আর বনের মাঝে বেমানান আমাদের। স্তব্ধ বনের মধ্যে হঠাৎ এমন হনুমানদের ডাকাডাকিতে পরিবেশ বেশ কিছুক্ষণ গরম ছিল। মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম পালানোর জন্য, যদি আমাদের আক্রমণ করে! না, আসলে এরা আমাদের প্রতিপক্ষের চোখে দেখছে না। খেলার ছলেই আমাদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাল। আর আমরাও অবাক নয়নে শুধু দেখেই গেলাম রোমাঞ্চকর এই মুহূর্ত।

হ্যাঁ, অভয়েই আছে আমাদের টিকে থাকা কিছু প্রাণী সম্পদ হবিগঞ্জের কালেঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্টে। খানিকটা সময় এদের সাথে কাটাতে গত ১৩ এপ্রিল চলে আসি এখানে। ১ বৈশাখ ছুটির দিন সব বন্ধুরা চলে গেছে কোথাও না কোথাও। তাই ঘরে মন টিকছিল না একদম। আর ঠিক তখনই মুঠোফোনে জানাল আমার এক বন্ধু ডায়না, ওর ভাই কালেঙ্গা ফরেষ্টের বাংলোটিতে ব্যবস্থা করতে পারবে থাকার জন্যে। তাই ঘর থেকে বেরোবে এমন মানুষদের খোঁজ করলাম। প্ল্যান করলাম সেদিনই রওনা হব নয়তো পরদিন। তাই হুট করে সিদ্ধান্ত নিতে সবারই একটু সময় লাগছিল। সময়টা এমনই দীর্ঘ ছিল যে কারোরই পাকাপোক্ত ঘোষণা পেলাম না। তারপরও সকাল ৮টায় সায়দাবাদে রিপোর্টিং সময় জানিয়ে ঘুমুতে গেলাম। যে আসবে তাকে নিয়েই রওনা হব, নয়তো...।

www.amaderchhuti.com

ঘড়িতে সময় সকাল ৭:২০মিনিট। সায়দাবাদ বাসস্ট্যাণ্ডে যাবার মাঝ পথে আমি। মুঠোফোনে বেগ ভাইয়ের ঘোষনা নিশাত আপু যাচ্ছে। সাথে তিনিও। ডায়না তো প্রথম থেকেই ছিল। আমাদের সঙ্গে না গেলেও রাতে রওনা হবে বিপ্লব ভাই। ব্যাস আর কি লাগে!!

ঠিক ৮ টায় পৌঁছালো সবাই বাসস্ট্যান্ডে। আগে থেকেই দেখে রাখা লোকাল বাসে চড়ে বসলাম। প্রি-প্ল্যান ছিলনা বলে লোকাল বাসই আমাদের ঠিকানা হল। বাসে উঠেই শুরু হয়ে গেল ট্রাফিক জ্যামের যন্ত্রণা। ৮.৩০ -এ বাস ছেড়ে যাত্রাবাড়ি পার হতেই সময় হয়ে গেল ৯.৩০। মনে একটাই সান্ত্বনা ছিল যে, আমাদের পৌঁছাবার কোন তাড়া নেই। তাই গল্পে গল্পে চলছিলাম পথ। পথিমধ্যে এক ছাগল ব্যাপারী তার ছাগল গুলোকে বাসে তুলে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন এটা লোকাল বাস। রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। যেখানেই থামছে গাড়ি ৫-১০ মিনিট করে সময় নিচ্ছে। তার উপর কন্ডাকটারের সাথে যাত্রীর ঝগড়া। বেশ উপভোগ করছিলাম সাধারণ মানুষের ভিড়ে পথের এই অভিজ্ঞতা। দীর্ঘ ৬ ঘন্টার সফর শেষে শায়েস্তাগঞ্জে নামিয়ে দিল বাসটি। দুপুর হয়ে যাওয়াতে রাস্তার এক ভাতের দোকান থেকে নলা মাছ দিয়ে দুপুরের ভুরিভোজ করে নিলাম। খেতে খেতে বেগ ভাই এলাকার সম্পর্কে কিছু কথা শুনালেন আমাদের।

শায়েস্তাগঞ্জ থেকে কালেঙ্গা ফরেস্ট অফিস অব্দি খুব বেশি ভাড়া চাইছিল অটোরিক্সাগুলো, তাই লোকাল নিয়মে জনপ্রতি ১৫ টাকায় চুনারুঘাট আসলাম। সেখান থেকে কিছু ড্রাইফুড ও একটি তরমুজ কিনে আবারও অটো রিক্সায় চেপে বসলাম। শহর থেকে অনেক দূরে আমরা। চারিদিকে শুধুই সবুজের রাজত্ব। গ্রামের সরু পথ ধরে চলছি। ৩০ মিনিটের এই পথের অনেক অংশই এখনো গাড়ি চলাচলের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয় নি। মেঠোপথ ভালই লাগছিল। দিনের শেষ ভাগে আমরা হাজির হলাম কালেঙ্গা ফরেস্ট অফিসে। টিলার উপর অফিস হওয়াতে এখানকার মানুষ অফিস টিলা নামেই জানে এই ফরেস্ট অফিসকে।

ফরেস্ট অফিসার আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা তাঁর ছোট ছেলেও আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি। খানিকক্ষণ গল্প চলল অফিসের সামনে বসে। আমাদেরকে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন বিট অফিসার। সবাই আমাদের ও বিশেষ করে নিশাত আপুকে পেয়ে খুবই আনন্দিত মনে হলো। যাই হোক সূর্য এখনো পশ্চিম আকাশে আলো ছড়াচ্ছে। সময় কিছু হাতে আছে, কোন রকম ফ্রেশ হয়েই বেড়িয়ে পড়বো বিকালটাকে কাজে লাগাতে। কাল যখন বাকি তিনজন যোগ হবে তখনই যাব ঘন জঙ্গলের ভেতর, তাই আজ সিদ্ধান্ত হল আলো থাকতেই অন্য দিকটা যতটুকু দেখা যায় দেখে নেব। ও হ্যাঁ বিপ্লবভাইয়ের সাথে শাহীন ও তার বন্ধু মেহেদী আমাদের সাথে যোগ হবে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানালেন বেগ ভাই।

একটি টিলার উপর বাংলোটি - তিন রুম ও বারান্দার সমন্বয়ে খুবই সুন্দর ও পরিপাটি। তার উপর সামনে একটি বড় আয়তনের ঘাসের গালিচা বেছানো মাঠ। বনের শত শত গাছে সেজে আছে চারপাশ। এখানে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায় দিনের পর দিন। বাংলো থেকে বনের দিকে যাওয়ার শুরুতেই হাতে ডানে দেখতে পেলাম বিজিবি-এর ক্যাম্প। আরও একটু এগোতেই পেলাম ছন বাড়ির পাড়া। বন কর্মকর্তাদের কাছে জানতে পারলাম এইখানে যারা বসবাস করে তাদের বেশির ভাগই বাঙালি। মারমা পাড়াও আছে কিছু। তবে তারা থাকে একটু ভেতরের দিকে।

লোকালয় ছেড়ে হাঁটছি। পাখির কলকাকলিতে মুখরিত চারিদিক। বন থেকে কিছু চাষাবাদের জন্য জমি ছিনতাই করে নিয়েছে এখানকার জনগোষ্ঠী। তাই প্রথম প্রথম বন আমাদের রাস্তা থেকে একটু দূরে দূরে ছিল। দূরে দেখা যাচ্ছিল বড় বড় গাছ যেন পাহাড়া দিচ্ছে বনকে। গাছের ডালে ডালে খেলছে শালিক, ফিঙ্গে, বউ কথা কও, কোকিল, ময়না, টিয়া, হলদে পাখি, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, ঘুঘু, সাদা বকসহ নাম না জানা শত শত পাখি। চলতে চলতে গাঁয়ের পথ রূপ নিল বনের পথে। পথটি চলল টিলা বেয়ে,ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠলো বন। বিকেলের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা। এখানে একটা দৃশ্য মনটাকে বড় খারাপ করে দিল - বড় বড় গাছ চুরির একি অভিনব পদ্ধতি! বড় গাছগুলির গোড়া কেটে অথবা পুড়ে এমনভাবে গর্ত করে রাখা যেন একটু জোর বাতাসে আপনাতেই গাছগুলি ভেঙে পড়ে। আর ঝরে পড়া গাছ কাটতে তো কোন অপরাধ নয়। বোঝো! হঠাৎ একটি অপরিচিত ডাক আমাদের কানে ভেসে এল। শব্দটির সাথে পরিচয় করালেন বেগ ভাই, এটা তক্ষকের ডাক। গুই সাপের মত দেখতে অনেকটা টিকটিকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বলা যায় একে। কখনো শিকারে বেরোয় না। ঠায় বসে থাকে,মুখের সামনে পোকা মাকড় এলে তবেই বেশ আয়েশ করে গলাধঃকরণ করে। দেড় ফিটের মত হবে এই তক্ষক। বনের ভেতর থেকে একে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা পেলাম অরেঞ্জ বেলি কাঠবিড়ালির। পুরো শরীরটা কালো। খুবই ব্যস্ত হয়ে ঘরে ফিরছিল। বিরামহীন এ গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে ঠিক একইভাবে যেতে দেখলাম আরেকটি কাঠবিড়ালিকে। সূর্য ডুবে সন্ধ্যা নামিয়ে দিল বলে। আমাদেরও ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।

কাল পহেলা বৈশাখ। পাশেই দেব বাড়িতে উপজাতির বাসভূমি। সন্ধ্যাকে উপেক্ষা করে সেই পথ ধরলাম। কোন উৎসব যদি পেয়ে যাই এই আশায়। সাথে দুটি টর্চও ছিল তাই অন্ধকারের ভয় ছিল না। সন্ধ্যায় যেন এক ভূতুড়ে রূপ নিল বন। ঘন জঙ্গল পেরিয়ে দেব বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলাম। তখনও সন্ধ্যার আলো নিভে যায় নি। দূর থেকে পাড়াতে কোন রকম উৎসবের আভাস পাওয়া গেল না, তাই অসময়ে তাদের বিরক্ত না করে ফেরার পথ ধরলাম।

www.amaderchhuti.com

সবাই একটু ক্লান্ত। সারাদিনের জার্নি সেইসাথে ট্রেকিং সব মিলিয়ে আরামের ঘুম দিতে চাই একটু গোসলের। টিলার উপর বাংলো তাই এখানে পানির ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র টয়লেটে ব্যবহারের পানি একজন এসে দিয়ে যায়। আমাদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা রহিম ভাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত রাতে তার বাসায় নিয়ে গেল গোসলের ব্যবস্থা করতে। আমি ও বেগ ভাই নামলাম পুকুরে আর নিশু আপু, ডায়না বাড়ির টিউবওয়েলে। বন্য এলাকার পাশে পুকুর, একটু ভয় ভয় করছিল। সাঁতার না জানার কারণে বেগ ভাইকে দিয়ে আমার সীমানা ঠিক করে নিলাম। খোলা আকাশের হাজার তারার মেলায় পুকুরে গোসল করার মজাই আলাদা। রাতে রহিম ভাইয়ের বাসায় আলু ভর্তা, ডিম ভাজি ও ডাল দিয়ে ভাত গোগ্রাসে খেলাম সবাই। পরে বাংলোর উঠানে চাদর বিছিয়ে কিছু সময় তারার স্নিগ্ধতা উপভোগ করে ঘুমাতে গেলাম।

বউ কথা কও পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো সকালে। ওদিকে সূর্য উদয়ের আগেই হাজির হলেন বিপ্লব ভাই, শাহীন ও তার বন্ধু মেহেদী। দলটি পেল পরিপূর্ণ রূপ।

তাড়াতাড়ি সবাই প্রস্তুত হলেও নাস্তা আমাদের একটু দেরি করিয়ে দিল। আজ পহেলা বৈশাখ। কাল রাতে কিছু ভাত পান্তা করার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাই বাঙালী ঐতিহ্য পান্তা ইলিম না পেয়ে শুকনো মরিচ পোড়া ও পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা খেয়ে নিই। সাথে খিচুড়ি ও ডিম ভাজা খেয়ে পেট ভরপুর। আজ আমাদের পথ দেখাবে একজন গাইড। কি কি পশু পাখি আছে এই বনে এবং কোথায় দেখা যায় সে তা ভাল করেই জানে। পথের শুরুতেই চশমা পরা বানর আমাদের স্বাগত জানালো ও বুঝিয়ে দিল আজ অনেকে কিছু দেখার সুযোগ আছে। তার জন্য চোখ কান সজাগ রেখে যতটুকু সম্ভব নিঃশব্দে পথ চলতে হবে। চৈত্রের তাপে গাছের শুকনো পাতা পায়ের নিচে মচ মচ করে শব্দ করছে। ধীরে ধীরে বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম। নানা পাখির ডাক শুনছি। যেগুলো চোখে পড়ছে তাদের নাম ও স্বভাব জানিয়ে দিচ্ছে গাইড। এই কালেঙ্গা বনে তিনটি ট্রেইল আছে - আধা ঘন্টা, তিন ঘন্টা ও চার ঘন্টার ট্রেইল। তবে গাইডকে আমরা সেই ট্রেইল থেকে সরিয়ে বনের আরও গভীরে যেতে রীতিমত বাধ্য করলাম।

অনেক পুরাতন গাছ রয়েছে এ বনে। গাছের গোড়া এতই মোটা যে ৫-৬ জন লাগবে হাতে হাত মিলিয়ে জড়িয়ে ধরতে। সেই গাছগুলোতে জড়িয়ে আছে বেশ মোটা মোটা লতা। বনের রাজা টারজান-এর চলাচলের জন্য উপযুক্ত এ বন। আমাদের বিপ্লব ভাইও মাঝে মাঝে টারজানের মত লতা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের গাইড ইশারায় দেখাতে লাগলেন বিভিন্ন রকমের ও রঙের পাখি। তেমন একটি মাছরাঙা দেখছি। হঠাৎ করেই এক দল

মুখপোড়া হনুমান হট্টগোল শুরু করে দিল। ভয় দেখাচ্ছিল না খেলা বুঝে উঠতে পারলাম না। বেগ ভাইতো বলেই ফেললেন, আমরা এসব সত্যি দেখছি না থ্রি ডি কোন মুভি চলছে। সত্যি, প্রকৃত বন এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে আমাদের। যত ভেতরে ঢুকছি আশা করছি ঘন বন সামনে আরও দেখতে পাব কিন্তু তেমনটা পেতে একটু বেশি ভেতরে যেতে হল। এখানকার স্থানীয় মানুষ হয়তো তাদের চলাচলের সুবিধার্থে বনে বিশাল অংশ পুড়িয়ে ফেলেছে। সে আগুনে অনেক ছোট, মাঝারি গাছ পুড়ে গেছে। কত যে দেশীয় গাছের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে এভাবে। খুব খারাপ লাগছিল বিবর্ণ এ চিত্র দেখতে। বন কর্মকর্তার সাথে কথা হল এ বিষয়ে। তিনি জানালেন এখানকার আদিবাসীরা এ কাজ করে থাকে তবে বর্তমানে অনেক নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন তাঁরা। দোয়া করি এরা যেন আরও আন্তরিক হয় এ ব্যাপারে। গাইড ভাইয়ের একটি মূল দায়িত্ব ছিল আমাদের উল্লুক দেখাবেন। যদিও তিনি বলেছিলেন সকাল ৮.৩০-র দিকে উল্লুক ডাকাডাকি করে আর তখনই তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। বনে ঝোপঝাড় পেরিয়ে উল্লুকের এলাকায় আসতে আমাদের ১০টা বেজে গেল। সেই সুযোগ হাত ছাড়া। অনেক খোঁজাখুজি করেও তারা আমাদের চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। এই বনে মোট ৫টি উল্লুক আছে। পিপাসার্ত চোখে উঁচু উঁচু গাছগুলো স্ক্যান করার মত এগিয়ে চললাম।

প্রকৃতির কাছে আমন্ত্রিত আমরা, এই প্রকৃতি তার মেহমানদের আপ্যায়ন না করে থাকে কিভাবে? মাঝ পথে আম গাছ পেলাম। গাছের নিচে অনেক আম পড়ে আছে। বেগ ভাই লবন ও মরিচ সাথে এনেছিলেন সুতরাং আম কুচি ভর্তা হয়ে গেল মুহূর্তেই। খাওয়া হলো এবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। সব ব্যবস্থাই রেখেছে প্রকৃতি। গাছের লতাগুলো এমনভাবে সাজানো ছিল ডায়না দোল খাওয়া শুরু করলো আর বেগ ভাইতো রীতিমত ঝুলানো বিছানা পেয়ে শুয়ে আরাম করে নিলেন।

জানাই ছিল ভারতের সীমানা বেশি দূরে নয় তাই সেই দিকেই পথ ধরলাম।

মানুষের চলাচলের বেশ ভাল পথ আছে সীমানা এলাকায়। চলতে চলতে গাইড হঠাৎ থেমে গেলেন একটা ভ্যালির মাঝামাঝি এসে। সবাইকে সতর্ক করে দিলেন তিনি। ভারতের কাঁটা তারের বাঁধ-এর খুব কাছে চলে এসেছি। বিদ্যুতের লম্বা থাম দেখা যাচ্ছে কাছেই। নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আমরা। পিছিয়ে আসতেই চোখে পড়ল সীমান্ত চিহ্নিতকারী পিলারটি। এখানে বেশ কিছু ছবি তুলে ফিরতি পথ ধরলাম। দুপুর বোঝাতে সূর্য মাথার উপর দিয়ে পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করেছে। সকালের খিচুড়ি- পান্তা অনেক আগেই তাদের শক্তি যোগানোর কাজ থেকে রিটায়ার করেছে। তাই পানি শূণ্য ছড়ার পথে বসে কাঁধে করে বয়ে আনা তরমুজ আর পাঁউরুটি খেয়ে আবারও যাত্রা শুরু করলাম।

www.amaderchhuti.com

ফেরার পথে আরো কিছু বানর, কাঠবিড়ালি আমাদের সাথে লুকোচুরি খেললো। অনেক ধরণের বট গাছ দেখলাম এখানে। কিছু বট গাছ তো অন্যের ঘাড়ে বড় হয়ে তার অস্তিত্বই শেষ করে দিয়েছে। মজার এক গুচ্ছ অর্কিড দেখা গেল উঁচু গাছের মাঝের ডালগুলোতে। লতার সাহায্যে সেই অর্কিডগুলো ঝাড়বাতির রূপ নিয়েছিল। এই কালেঙ্গা বনের আরেকটা আকর্ষণ হলো বড় কাঠবিড়ালী। আমরা দুধরনের কাঠবিড়ালী দেখেছি, বাদামী কাঠবিড়ালী ও কমলা পেটের কাঠবিড়ালী। বাকি ছিল বড় কাঠবিড়ালী। দুপুর বেলায় উঁচু গাছের সমান্তরাল ডালে শুয়ে থাকে সে, জানালো গাইড। ভাগ্য ভাল ছিল তাই একটি বড় কাঠবিড়ালী এ গাছ ও গাছে যাওয়ার পথে আমাদের চোখে ধরা পড়ল।

সারাদিনের হাঁটায় ক্লান্ত সবাই কিন্তু চোখে মুখে পরিতৃপ্তির আভা স্পষ্ট। ফেরার একদম শেষদিকে প্রাকৃতিক একটি ঝিল দেখতে পেলাম। একেতো পরিশ্রান্ত, তার উপর ঝিলের টলটলে পরিষ্কার পানি দেখে লোভ সামলাতে না পেরে অনেকেই ঝিলের জলে ডুব দিলেন। এ যেন এক শুভ সমাপ্তি।

~ তথ্য - কালেঙ্গা অভয়ারণ্য ~

মাউন্টেনিয়ারিং আর নানান অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা ছেলেবেলা থেকেই। 'এক্সপ্লোর বাংলাদেশ' ট্যুরিজম সংস্থার ট্রাভেল এক্সিকিউটিভ মহি-র স্বপ্ন সাইকেলে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ।

Rate This : - select -
Total Votes : 7
Average : 4.57

Like Susmita Mukherjee Ghosh and 28 others like this.

tell a Friend

গডউইনের সমাধির খোঁজে

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

"আমরা তিনজন ঘাস-গজিয়ে যাওয়া বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দু'দিকে সমাধির সারি - তার এক-একটা বারো-চোদ্দ হাত উঁচু। ডাইনে কিছু দূরে একটা সমাধি প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। ফেলুদা বলল, 'ওটা খুব সম্ভবত পন্ডিত উইলিয়াম জোনস-এর সমাধি, ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।'

প্রত্যেকটা সমাধির গায়ে সাদা কিম্বা কালো মার্বেল ফলকে মৃতব্যক্তির নাম, জন্মের তারিখ, আর মৃত্যুর তারিখ, আর সেই সঙ্গে আরও কিছু লেখা। কয়েকটা বড় ফলকে দেখলাম অল্প কথায় জীবনী পর্যন্ত লেখা রয়েছে। বেশির ভাগ সমাধিই চারকোনা থামের মতো, নীচে চওড়া থেকে উপরে সরু হয়ে উঠেছে। ... 'এই স্তম্ভগুলোর ইংরিজি নামটা জেনে রাখ তোপসে। একে বলে ওবেলিস্ক।' ডান-দিক চোখ ঘোরাচ্ছি আর ফলকের নামগুলো বিড়বিড় করছি - জ্যাকসন, ওয়টস্, ওয়েলস্, লারকিনস, গিবনস, ওল্ডহ্যাম...। মাঝে মাঝে দেখছি পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে - বোঝা যাচ্ছে সবাই একই পরিবারের লোক। সবচেয়ে আগের তারিখ যা এখনপর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮ জুলাই ১৭৭৯। তার মানে ফরাসি বিপ্লবেরও বারো বছর আগে।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে বুঝতে পারলাম গোরস্থানটা কত বড়। পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিকের শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।"

- সত্যি, মেঘলা ভিজে ভিজে দুপুরে পার্কস্ট্রিটের এই সমাধিচত্বরের অনেকটা ভেতরে সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে বুকলেটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঠিক আর বর্তমান কলকাতায় আছি বলেই মনে হচ্ছিল না। কবরখানা এখন অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো - তবু যেন মেঘলা দুপুরে ইতিহাস ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমাদের।

'গোরস্থানে সাবধান' বুইয়ের হাতে - ওর জন্যই আরও বেশি করে এখানে আসা। টমাস গডউইনের সমাধিটা খুঁজে বের করবেই। এত বড় হয়ে গেল তাও কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে গল্পটা আসলে গল্পই। একেকটা পরিবেশে অবশ্য সত্যি নিজেদেরও যেন অন্যরকম বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও করে।

বেলা একটা নাগাদ পৌঁছেছি। ঢুকেই ও বলল, সোজা একেবারে শেষে পৌঁছে বাঁয়ে - মানে এগুলো বেশ মুখস্থই থাকে পাতার পর পাতা! আমরাও তিনজন - সেই একই পথে এগোই। তবে এখন আর ঘাসে ঢাকা পথ নয় - পরিষ্কার। বর্ষায় শ্যাওলা গজিয়ে উঠছে দেখে নিয়মিত ব্লিচিং দেওয়া হয়, বালিও ছড়ানো রয়েছে।

এরমধ্যে বারদুয়েক পুরো চত্বরটা ঘোরা হয়ে গেছে। প্রাচীন রোমান এবং গ্রীক স্থাপত্যের আদলে অসংখ্য কুপোলা, ওবেলিস্ক, পিরামিড ও মুসোলিয়া। আমি কিন্তু প্রাচীন হিন্দু মন্দির আর মুসলমান স্থাপত্যের আদলও খুঁজে পাচ্ছিলাম। প্রাচ্যবিদ এবং পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জোনসের সাদা রঙের সবথেকে উঁচু কবরটি বারবারই চোখে পড়ছিল। ঘুরতে ঘুরতে রাউডন স্ট্রিটের দিকে পশ্চিম চত্বরে খুঁজে পাওয়া গেল পাতাবাহার গাছে ঘেরা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র সমাধি - 'টিচার, পোয়েট, প্যাট্রিয়ট অ্যান্ড মেন্টর অব ইয়ংবেঙ্গল'। ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় পড়া ডিরোজিওর জীবন ও ভাবনা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আমার মেয়ে এখন সেই বয়সে পৌঁছেছে। এতবছর পর ওকে সঙ্গে নিয়ে সেই মানুষটির সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মেঘলা মনকেমন করা দুপুরে সত্যি অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল।

পন্ডিত উইলিয়াম জোন্সের সমাধি

এই চত্বরেই কিছুটা আগে রাস্তার ধারে বাঁয়ে মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্টের হিন্দু মন্দির আকৃতির সমাধিটি চোখে পড়ে। এও আরেক অন্যরকম চরিত্র। 'হিন্দু' স্টুয়ার্ট শুধু যে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাই নয়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। প্রতিদিন সকালে উঠে গঙ্গাস্নানে যেতেন এবং বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতার পুজো করতেন। মহিলাদের শাড়ি পরাও তাঁর খুব পছন্দ ছিল। স্টুয়ার্ট তাঁর বইতে ভারতীয় সভ্যতার কথা খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশদের উচিত এই সভ্যতাকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা। স্টুয়ার্টের সমাধিটিও অন্যান্য সমাধিগুলির থেকে স্থাপত্যে ভিন্ন। খানিক নষ্ট হয়ে গেলেও সমাধিতে খোদিত দেবদেবীর মূর্তি, পদ্ম ও অন্যান্য কারুকাজ হিন্দু মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ এর মাত্র কয়েকবছর পর আর এক ভারতপ্রেমিক ডেভিড হেয়ারের কবর এখানে দেওয়া যায়নি ইউরোপীয় কমিউনিটির আপত্তিতেই। -

এমনই কত কাহিনি, কত অশ্রু জড়িয়ে আছে একেকটা সমাধির সঙ্গে। শুধু টমাস গডউইনের সমাধিটাই কোথাও নেই - আমরা তিনজনেই এখন খুঁজছি

www.amaderchhuti.com

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র সমাধি

কীনা...

কখনও বাঁধানো রাস্তা দিয়ে কখনওবা ভিজে ঘাস মাড়িয়ে চলি। কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা খোলা ঘাসজমির মধ্যে এখানেওখানে ছড়িয়ে আছে কবরগুলো, কোথাওবা বড় বড় গাছের সারির মাঝে মাঝে। মেঘলা দুপুরে গাছের ছায়ায় নিস্তব্ধতা যেন আরও ঘন হয়ে আসে। কোথাওবা গাছপালায় ঘেঁষাঘেঁষি-ঠেসাঠেসি করে কেমন একটা আধো অন্ধকার থমথমে, গা ছমছমে ভাব - বুইয়ের ভাষায় ডেথলি না না, ডেডলি...। লালমোহনবাবু থাকলেও কি তাই বলতেন? কে জানে! আমরা ছাড়াও দর্শক আর অল্প কয়েকজন, তারমধ্যে একদল বিদেশি - স্পেন থেকে এসেছে। এখানে সারাবছরে প্রায় আটশো-হাজার দর্শনার্থী হয়। কেউবা আসেন পূর্বপুরুষের স্মৃতি খুঁজতে, কেউবা নিছক ইতিহাসের পাতা ওল্টাতেই।

১৭৬৭ সালে দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারি বা 'দ্য গ্রেট সিমেটারি' চালু হয়। ১৮৩০ সালে শেষ সমাধিটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সবচেয়ে পুরনো সমাধিটি সারা পিয়ারসনের, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৮ তারিখের। ১৯৭৮ সালে কবরখানাটির সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। দেড়শো বছরের অবহেলায় তখন পুরো জায়গাটা জঙ্গলাকীর্ণ - সাপখোপ, কুকুর আর চোর-ডাকাতের আড্ডা। 'গোরস্থানে সাবধান' পড়তে গিয়ে কিন্তু সেই পুরনো কবরখানার জঙ্গলে ঢাকা ভগ্ন চেহারাটাই চোখে ভেসে ওঠে। খুব সম্ভব কাহিনির সময় আটাত্তরের এদিক-ওদিক।

ডাকসাইটে সুন্দরী শ্রীমতি এলিজাবেথ জেন বারওয়েলের সমাধিটি চওড়ায় বেশ বড় - পশ্চিমদিক ঘেঁষে। বিয়ের আগে মিস স্যান্ডারসন বহু ইংরেজ পুরুষের হার্ট থ্রব ছিলেন। একবার এক বলনাচের আসরের আগে তাঁর প্রণয়প্রার্থী যুবকদের সকলকেই গোপনে তিনি কী রঙের পোষাক পরে আসবেন তা জানিয়েছিলেন। সেদিনের আসরে দশ-বারোটি যুবক এলিজাবেথের পোশাকের সঙ্গে মানানসই সবুজ রঙের পোষাকে হাজির হন। শোনা যায় মুগ্ধ অনুগামীদের কাউকেই ফিরিয়ে দেননি এলিজাবেথ, নেচেছিলেন সকলের সঙ্গেই। নাচের আসর ভাঙ্গলে সেইসব যুবকেরা এলিজাবেথের পালকির দু'পাশে দুটি সারিতে গান গাইতে গাইতে তাঁকে এগিয়ে দেন।

www.amaderchhuti.com

সেইসময়ের বহু ইংরেজ মহিলার মতো অল্পবয়সেই মারা যান এলিজাবেথ। সমাধিগুলির তারিখ পড়লেও একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে কলোনী স্থাপনের শুরুতে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়, প্রতিকূল অচেনা পরিবেশ, দুর্ঘটনা এবং সর্বোপরি নানান রোগ-ব্যাধি কেড়ে নিয়েছিল অনেক জীবনই। দশ-বারো-চোদ্দ, এমনকী তার চেয়েও ছোট অনেক শিশুরই নীচু নীচু সমাধিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বড় বড় সমাধির ফাঁকে ফাঁকে।

This lovely bud so young and fair
Called hence by early doom,
Just came to show, how sweet a flower,
In paradise will bloom.

- তারপর কত শীত, কত বসন্ত কেটে গেছে, কিন্তু পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতা আজও মুছে দিতে পারেনি কালের আঁচড়।

নানান পেশার, নানান জগতের কত মানুষ এখানে চিরশয্যায় শুয়ে রয়েছেন - বিচারক জন হাইড (১৭৯৬), স্যার জন রয়েড (১৮১৭) [এঁর নামেই রয়েড স্ট্রিট], মেরি বাওয়ার [নবাব সিরাজদৌল্লার ফোর্ট উইলিয়াম ধ্বংসের সময় ইনি দুর্গ থেকে পালাতে পেরেছিলেন], ব্রিটিশ নৌবাহিনির ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড কুক, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের প্রপৌত্রী লেডি আনে মসন (১৭৭৫) ও তাঁর স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জর্জ মসন, বর্তমান সেন্ট থমাস স্কুলের একদা প্রধানশিক্ষক রেভারেন্ড ডঃ জন ক্রিশ্চিয়ান ডিমার। এমন আরও কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র তাঁদের কাহিনি। ব্রিটিশদের পাশাপাশি রয়েছে অনেক আর্মেনিয়ান কবরও।

সতেরো বছরের উচ্ছল তরুণী রোজ আয়েলমার ভালোবেসেছিল কবি লাভোরকে। কবির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে ওয়েলসের পাহাড় আর সমুদ্রতীর। ভারতবর্ষে পৌঁছানোর মাত্র একবছরের মধ্যেই কলেরায় প্রাণ হারান রোজ। প্রিয়তমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা বিরহী লাভোরের কবিতাটি রয়েছে রোজের সমাধিফলকে। মুল প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে একটু এগোলেই বাঁহাতে ক্যাপ্টেন কুক আর রোজ আয়েলমারের সমাধিদুটি চোখে পড়ে।

ইতিহাসের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মিশে যায় মানুষের কল্পনা। কারখানার পুবে লোয়ার সার্কুলার রোডের দিকে এম ডেনিসনের কবরটির পরিচিতি 'ব্লিডিং গ্রেভ' বলে। সময়ে সময়ে এই কবর থেকে নাকি রক্তের মতো লাল রঙের কোন তরল বেরিয়ে আসে। ভাগ্যিস্, লালমোহনবাবু শোনেননি, নইলে

শুধুই 'গেরোস্থান' না বলে আঁতকে উঠে আরও কত কী যে বলতেন, কে জানে!

কত অজানা গল্পইতো জানা গেল এই ঘুমন্তপুরীতে হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু গডউইনের সমাধিতো কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না - বুইয়ের মনটা আকাশের মতই মেঘলা। ঘুরতে ঘুরতে শেষে পশ্চিমদিকের একটা কোণ কিছুটা চেনা চেনা লাগে। নাইবা লেখা থাকুক টমাস গডউইনের নাম - আসলে চ্যাপ্টা সমাধিটার ওপরটা কালো হয়ে গেছে, কোন নামই আর পড়া যাচ্ছেনা। কাছে বেশ বড় বড় কয়েকটা গাছও রয়েছে। দিব্যি ভেবে নেওয়া যায় এটাই টমাস গডউইনের সমাধি, আর এখানেই সমাধির গভীরে মাটির অনেকটা নীচে রয়েছে সেই বিখ্যাত 'পেরিগাল রিপিটার' - গল্পটা তাহলে এখান থেকেই শুরু হোক... ।

'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন দৈনিক 'কালান্তর', 'স্বর্ণাক্ষর' ও 'আজকাল' প্রকাশনার সঙ্গে। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে মুক্ত সাংবাদিকতা করছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

Rate This : - select -
Total Votes : 14
Average : 4.29

Like Suman Samaddar, Kakali Sengupta and 4 others like this.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

সারাদিনই মোটামুটি খোলা থাকে,আমরাতো সকালে এগারোটা-সাড়ে এগারোটা নাগাদ গিয়েছিলাম। বিকেলে পাঁচটা নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়।

- দময়ন্তী [2013-07-24]

খুব ভালো লেগেছে। গোরস্হান কোন সময় জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে, সেটা জানালে খুব ভালো হয়।

- Kakali Sengupta [2013-07-24]

খুব ভালো লেগেছে। গোরস্হান কোন সময় জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে, সেটা জানালে খুব ভালো হয়।

- Kakali Sengupta [2013-07-24]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ঈশ্বরের আপন দেশে

ঝুমা মুখার্জি

হর-কি-দুনের তথ্য || ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

গরমের ছুটিতে মানুষের ভিড় পাহাড়ে, কটাদিন অন্তত দাবদাহ থেকে মুক্তি। গরম জামাকাপড়ে বাক্স ভর্তি করে সপরিবারে মুসৌরি-নৈনিতাল রওনা দেন ভ্রমনবিলাসীর দল।
আবার ছমাস বন্ধ থাকার পর গাড়োয়ালের মন্দিরগুলিও দর্শনের জন্য খোলে এখন। অসংখ্য তীর্থযাত্রী তাই এই পথে পা বাড়ান।
আডভেঞ্চারপ্রেমী পর্বতারোহীর দল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অজানা পথে পাড়ি দেন এই সময়েই।
আবার আমার মত কেউ আছেন যারা ছকে বাঁধা আটপৌরে জীবনে একটু রোমাঞ্চের স্বাদ নিতে পাহাড়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন। সবাই একমত হবেন কিনা জানি না, তবে সকলের জন্যই গাড়োয়াল হিমালয় আদর্শ। বিধাতা এখানে প্রকৃতিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। অজস্র নদী, ঝরনা, সবুজ বনানী, বুগিয়াল, ফুল আর পাখিতে সুসজ্জিতা প্রকৃতি। আর এখানকার প্রতিটি স্থানকে ঘিরে আছে পৌরাণিক গল্প আর মানুষগুলো ও বড়ই সরল-সাদাসিধে। প্রতি বছর এখানে ট্রেক করতে গিয়ে গাড়োয়ালিদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে আমরাও কটাদিন অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এবারে আমরা মানে আমি ও অনিন্দ্য যাচ্ছি 'হর কি দুন'। শিবের উপত্যকা বা ভ্যালি অব গডস নামে পরিচিত এজায়গা।
৩১ মে, দিল্লি থেকে দেরাদুনগামী একটি ট্রেনের জেনারেল শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলাম, কোনরকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছি। প্রচণ্ড গরমে ভীড়ের চাপে নাজেহাল অবস্থা আমাদের। হরিদ্বার পৌঁছতেই ট্রেন প্রায় খালি, আগামীকাল দশহরা উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে চলেছে হাজার হাজার পুণ্যার্থী। বাকি রাস্তা ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম ।
রাত সাড়ে আটটায় দেরাদুন স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে উঠলাম। রাতটা কাটিয়ে পরদিন, ১ লা জুন সকাল সকাল বাস স্ট্যান্ডে চলে গেলাম।। পুরোলাগামী বাসে উঠে বসলাম। বাস ছাড়তে ছাড়তে ৭টা বাজল। বাস তো ভরে গেল, তিল ধারণেরও জায়গা নেই। স্থানীয় মানুষেরই ভিড়। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। এই রাস্তা দিয়ে আগেও গেছি মুসৌরি বেড়ানোর সময়। আবারও ছবির মত সুন্দর রাস্তা দিয়ে যেতে ভাল লাগছিল। মিষ্টি শীতল হাওয়ায় মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। ৩৫ কিমি দূরে মুসৌরি পৌঁছতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগল,রাস্তায় পড়ল কেম্পটি ফলস, বাস থেকেই দেখে নিলাম। এখনও চেনা পথেই চলেছি। কিছুক্ষণ পর অচেনা অদেখা পথে যাত্রা,যার জন্যইতো বেরিয়ে পড়া। যে জায়গায় যাব বলে মনস্থির করেছি,তার সম্পর্কে বই আর ইন্টারনেট ঘেঁটে যা তথ্য পেয়েছি তাই সম্বল করে দুই প্রকৃতিপ্রেমিকের বেরিয়ে পড়া। না করেছি কোথাও বুকিং, না নিয়েছি গাড়ি,না আছে বড় দল। বেড়িয়ে পড়েছি দুগ্গা দুগ্গা বলে। আর এইভাবে বেরিয়ে পড়ি বলেই হয়তো প্রকৃতিকে অনেক কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কদিনের জন্য খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বুকভরে তাজা শ্বাস নিতে পারি। নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাই। এই পাওনা যে কতখানি অমূল্য তা আমিই জানি। হিমালয়ের অমোঘ টান উপেক্ষা করতে পারি না, তাই বারবার ছুটে আসতে হয়।
বাস পুরোলা পৌঁছল দুপুর বারটা নাগাদ। এখান থেকে আরও ৬০ কিমি যেতে হবে। এখানে জি.এম.ভি.এন-এর গেস্ট হাউস আছে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান-বাজার আছে। ট্রেকাররা এখান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এই রুটে এটাই শেষ শহর, এরপর মোবাইল পরিষেবা, বিদ্যুত বা অন্য কোন আধুনিক পরিষেবা এসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে কদিন। তবে আজকাল সোলার প্যানেল ডিশ টিভি লাগাচ্ছে কেউ কেউ। এখানে মানুষের আনাগোনা বেড়ে গেলে আধুনিকতার পরশ ইকোসিস্টেমের ওপর তার এফেক্ট ফেলবে, বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে তার প্রভাব পড়বে।

ফরেস্ট বাংলো থেকে দেখা

আমাদের এই বাস সাঁকরি অব্দি যাবে। কিন্তু পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। আমরা ভেবেছিলাম এখান থেকে শেয়ার জীপে বাকি রাস্তা যাব। কোনো জীপ পাওয়া গেল না তাই বাসেই আবার উঠতে হল। বাস যত এগোচ্ছে প্রকৃতিকে তত সুন্দরী লাগছে। জানলায় চোখ আটকে আছে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে জলধারা নেমে আসছে কখনও সে চঞ্চলা কিশোরী, কখনও শান্ত পূর্ণযুবতী। বাস থামছে। স্থানীয় মানুষ নামছে উঠছে। বেশিরভাগই মহিলা। এদের পোশাক ও গয়নায় রঙের বাহার আর অমলিন হাসি নজর কাড়বে। ঘন্টা দুয়েক পর পৌঁছে গেলাম মোরি। অসাধারণ জায়গা। পাহাড়, নদী, সবুজ বনানী সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব এক চিত্রপট। থাকার জন্য ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। দুদিন নিরালায় ছুটি কাটানোর এক দারুন স্পট। এরপর বাস থামল ২১ কিমি দূরে নেটওয়াড়ে, গোবিন্দ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির প্রবেশদ্বার। এখান থেকে প্রবেশ মুল্য দিয়ে অনুমতি নিয়ে তবেই প্রবেশ করা যায়। আমরাও তাই করলাম। এই বনাঞ্চল আকারে ৯৫৭.৯৬৯ বর্গ কিমি। ১৯৫৫-র ১ মার্চ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির পশুপক্ষী ও জীবনদায়ী উদ্ভিদের জন্য সংরক্ষিত। স্নো লেপার্ড, ব্ল্যাক বিয়ার, ব্রাউন বিয়ার, মাস্ক ডিয়ার, গোল্ডেন ঈগল এই অঞ্চলে বাস করে। নেটওয়ারে রুপিন ও সুপিন নদী মিলিত হয়েছে,এরপর টন্স নাম হয়েছে। আর ১২ কিমি যেতে হবে। এক কমবয়েসি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল বাসে, পড়াশুনা করছে, নাম চমন। ছুটিতে গাইড- পোর্টারের কাজ করে। ঠিক হল আমাদের সঙ্গে ছ'দিন থাকবে চমন। বিকাল ৫টায় সাঁকরি এসে পৌছলাম। জি.এম.ভি.এন.-এ উঠলাম। গেস্টহাউসের অবস্থান পাহাড়ের মাথায়। ভীষণ ঠাণ্ডা, সঙ্গে কনকনে হাওয়া। মুখহাত ধুয়ে একটা ছোট দোকানে চাউমিন আর চা খেলাম। তারপর আধ কিমি নীচে সর্ গ্রাম ঘুরে এলাম। এখানে চমনের বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটালাম। আমাদের ক্যামেরার ব্যাটারি আরেকবার চার্জ করে নিলাম।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে, দূরে পাহাড়ে রঙের ছটা। আঁধার নামবে। তার আগেই ফিরে এলাম গেস্টহাউসে। ঠাণ্ডা আরও জমিয়ে পড়ছে। এখানে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার দেখা আমরা পেলাম না। ঘরে মোমবাতি জ্বেলে বসে না থেকে চেয়ার নিয়ে বাইরে বসলাম। চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে,দু' এক দিন পরই পূর্ণিমা। মনে হচ্ছিল সব ছেড়ে এখানে এসে থাকলেই তো পারি। কেয়ারটেকার নানাজি আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। ওনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন, কালকের ট্রেক প্রসঙ্গেও নানা খুঁটিনাটি বলে দিলেন। ন'টায় ভাত, রাজমা, রুটি আর অরগানিক সব্জি খেয়ে সোজা লেপের তলায়। কাল ২ জুন আমাদের যাত্রা শুরু।

www.amaderchhuti.com

খুব ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাহাড়ে খুব তাড়াতাড়ি সূর্য উঠে যায়। বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম । কিছুক্ষণ পর আমরা গাড়ি নিয়ে তালুকার দিকে যাত্রা করলাম। এই রাস্তায় সবসময় গাড়ি যায় না। ল্যান্ডস্লাইড হলেই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ভেবেছিলাম হেঁটে যেতে হবে, গাড়ি যাচ্ছে তাই আমাদের একটা দিন বেঁচে গেল। রাস্তা অবশ্য সেইরকমই, কতবার যে আমার মাথা ঠুকল! কোমর, পেট ব্যথা হয়ে গেল। কিছুটা রাস্তা ভাল, বাকিটা বোল্ডার বিছানো। দু'এক বার গাড়ি বন্ধ হল আবার চলল, প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগল তালুকা আসতে।

তালুকা - সুপিন নদীর তীরে - ট্রেক শুরু

এখানে পৌঁছেই পেলাম বরফঢাকা সাদা হিমালয়ের দেখা। আকাশ আয়নার মত তকতক করছে আর ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে, সুন্দরী প্রকৃতি যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। এমনিতে জায়গাটা ভীষণ অপরিচ্ছন্ন। ঘোড়া আর খচ্চর নোংরা করে রেখেছে। জি.এম.ভি.এন-এর গেস্টহাউস আছে,কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয়। সবাই সীমা গিয়েই রাত্রিবাস করে। সোজা রাস্তা সুপিন নদীর পাশ দিয়ে গেছে, যেন মনে হচ্ছে আমরা নদীর তীর ধরে সোজা উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজ দীর্ঘ ১৪ কি.মি. ট্রেক করতে হবে। তাই প্রথম থেকেই পা চালানোর নির্দেশ এল। কিন্তু এ পথ হেঁটে শেষ করার জন্যই কি আসা? গন্তব্যে পৌঁছনোই কি উদ্দেশ্য? আমার মতে তা নয়,প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখব,তার রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করব,কখনও যেন পথচলা ক্লান্তিকর না হয়। আমাদের পোর্টার এগিয়ে অনেকদূর চলে গেছে, আমার সঙ্গীটিও দ্রুত হাঁটছে। আমি পিছিয়ে পড়ছি। তাড়াহুড়ো না করে নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম,দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা নেমে আসছে,হাত দিয়ে দেখলাম ভীষণ ঠাণ্ডা জল। জুতো না ভিজিয়ে পার হলাম। এরকম জলধারা পথে অনেক পড়ল। একঘন্টা পর রাস্তা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বোল্ডার বিছানো রাস্তা পেরিয়ে কাঠের পুল পার হলাম,যার নীচ দিয়ে খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। তারপর অনেকটা খাড়া চড়াই পেরিয়ে সমতলে এলাম।

এক বিদেশি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল, অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন হিমালয়ের টানে। ওনারা হর কি দুন থেকে ফিরছেন। বল্লেন, ইন্ডিয়া এত ভাল লাগে যে বারবার আসতে ইচ্ছা করে, আগে চারবার এসেছেন। শুনে বেশ ভাল লাগল। প্রথমদিন আর অনভ্যাস তাই বেশ কষ্ট হচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে ভিডিও ক্যামেরা চালালাম, পাখির কলতান, ঝরনার-নদীর পথ চলা, নাম না জানা ফুলের বাতাসের সঙ্গে সংলাপ, রঙ্গিন প্রজাপতি ক্যামেরাবন্দি করলাম। আখরোট, পাইন, ওক, চীর, দেওদার, ভূর্জগাছ প্রচুর আছে। তাছাড়া বিরল প্রজাতির হার্বস - ভেষজ উদ্ভিদের জন্যই এ অরণ্য সংরক্ষিত। সাদা বুনো গোলাপের ঝাড় তো অনেক - আর তার গন্ধও খুব মিষ্টি। এখানে পথে একটাই গ্রাম পড়ে তাছাড়া কোনও চা খাবারও জায়গা নেই। তার জন্য এখনও ৩ কি.মি. যেতে হবে। তাই মুখে লজেন্স, চুইংগাম রাখছিলাম। পথে ছোট বাচ্চারা মিঠাই চাইছিল, মানে টফি। আমাদের সঙ্গে যা ছিল ওদের দিলাম, ওদের হাসিমুখের ফটো তুললাম। এদের দেখে ভীষণ কষ্ট হল, পরনে ধুলিধুসরিত জামা, না পায় সঠিক শিক্ষা, না পায় পেট পুরে খেতে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও কত কিছু থেকে বঞ্চিত। গ্রামের পুরুষরা কাজ করে না, নেশা করে ঘুমিয়ে কাটায় আর মহিলারা সারাদিন পরিশ্রম করে সংসার চালায়।

অবশেষে চায়ের দোকান পাওয়া গেল। নদীর কিনারে কাঠের একটা ঘর, সুন্দরী যুবতী মিঠা চা খাওয়ালো। দূরে গাঙ্গার গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিছু লজেন্স আরও কিনে রাস্তায় বাচ্চাদের দিতে দিতে গেলাম। একটা সেতু পেরিয়ে আবার কঠিন চড়াই। স্বর্গারোহিনী মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। রোদের তেজ ফিকে হয়ে আসছে। নদীর তীরে এক দল কিশোরকে দেখা গেল। এরা চন্ডীগড়ের একটি স্কুল থেকে এসেছে। আজ এরা এখানেই টেন্টে থাকবে। আমরাও প্রায় এসে গেছি। বিকাল ৫টা নাগাদ সীমা ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম। গরম গরম ম্যাগি, কফি খেয়ে সোজা বিছানায়। একঘন্টা পর অনিন্দ্যর ডাকে ঘুম ভাঙল। সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে, কী জানি কাল কী করে হাঁটব? আমাদের পাশের ঘরেই এক বাঙালি এসেছেন একা, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। উনি আমাদের মত নভিশ নন, একমাসের ছুটি নিয়ে বেরিয়েছেন। ৫৭ বছর বয়স, হিমালয়ের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। অনেক এক্সপিডিশনেও গিয়েছেন। চা খেতে খেতে ওনার বেড়ানোর অনেক গল্প শুনলাম। সঙ্গে রান্নার সামগ্রী নিয়েই এসেছেন। পোর্টার ছেলেটি রান্নাবান্না সব করছে। আমাদের পাশেই ধাবায় গিয়ে খেতে হল। রুটি, রাজমা, ভাত আর লিংড়ার সব্জি। অল্প পরিমাণে খেয়ে গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। এখানে গ্যাস, কয়লা বা কেরোসিন কিছুই নেই। জঙ্গলের কাঠ জেলে রান্না করতে হয়, কিন্তু রান্নার স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি।

www.amaderchhuti.com

৩ জুন সকালে চা পান করে , আলুর পরাঠা, আচার প্যাক করে সীমা ছাড়লাম যখন সাড়ে সাতটা বাজে। আজও ১২ কি.মি. হাঁটতে হবে আর ৮৫০০ফুট উচ্চতা থেকে ১১৫০০ ফুট উচ্চতায় উঠতে হবে। আজকেও আকাশ পরিস্কার, সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে। নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করলাম। আজ কঠিন চড়াই আছে,কালকের মত জঙ্গলের রাস্তাও নয়। সূর্যের তাপ সরাসরি মুখে লাগবে। ফরেস্ট রেস্ট হাউস ছেড়ে খানিকটা যেতেই সুপিন নদীর ওপর ঝুলন্ত ব্রীজ, এখান থেকে কিছু ছবি তোলা হল। তারপরই আধ কি.মি. সাঙ্ঘাতিক চড়াই,শুধু তাই নয় এখানে আলগা পাথুরে মাটি তাই পা স্লিপ করছে। লাঠির সাহায্যে উঠলাম। বাঁদিকে ওঁসলা গ্রামের রাস্তা গেছে, এপথের শেষ গ্রাম এটি। শোনা যায় মহাভারতের কৌরবদের উত্তরসূরিদের বাস এখানে, দুর্যোধনের মন্দিরও আছে। আমাদের সময় না থাকায় আমরা সোজা পথ ধরলাম।

প্রাকৃতিক মিনারেল ওয়াটারের উৎস

একটু পরেই গরমে জ্যাকেট খুলে ফেলতে হল। বারবার জল তেষ্টাও পাচ্ছে। অনেক ঝরনা রাস্তায় পড়ছে, সঙ্গের জল শেষ হলেই ওই বোতলে ভরে জিওলিন দিয়ে পান করছি। ঠাণ্ডা আর স্বাদও ভাল। যেতে যেতে এক বিশালাকার ঈগল মুহূর্তের জন্য দেখা দিল। শট নেবার সুযোগ দিল না। তবে সারাক্ষণ একটা পাখির মিষ্টি গান শুনতে পাচ্ছি। নাম না জানা এই পাখির তো আমি প্রেমে পড়ে গেছি, ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েই লুকিয়ে পড়ছে। অনিন্দ্য অনেক কষ্টে ফোকাস করতে পারল। আজ হাঁটতে আরও বেশি ভাল লাগছে। সামনেই স্বর্গারোহিনী, বন্দরপুঞ্জ হাতছানি দিচ্ছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্কুল পড়ুয়ার দলও হেঁটে চলেছে নিজের নিজের স্যাক নিয়ে । শর্টকাট রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে সাঙ্ঘাতিক চড়াই উঠতে হল। তারপরই একটা অপরূপ সুন্দর ভ্যালিতে পৌঁছলাম। কাঁচের মত স্বচ্ছ নীল আকাশ, বরফ শৃঙ্গ আর সবুজ গমের ক্ষেত যেন আমাদের জন্য স্বর্গ রচনা করেছে। গম গাছগুলো বাতাসের দোলায় হিন্দোলিত হচ্ছে,নরম মিঠে রোদ পড়েছে তার ওপর। ক্ষেতের বুক চিরে সেই পথেই আবার এগিয়ে চললাম। এবার একটু গতি বাড়ালাম। বেশ অনেকটা সমতল দিয়ে হেঁটে গেলাম। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি। পরাঠা,আচার,মিষ্টি,চানাচুর খেয়ে আবার পথ চলা। এই রাস্তায় বড় গাছ প্রায় নেই। লাল, বেগুনি, আকাশি নানা রংয়ের ছোট-বড় ফুল সবুজ ঘাসে ফুটে আছে, ঠিক যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি। এখানে ফুলের বাগান যেন প্রকৃতি নিজেই সাজিয়ে রেখেছে। ফুলের অনেক ছবি তুললাম,ওদের স্পর্শ করলাম না।

দুপুর ১২টা, সূর্যদেব মধ্যগগনে, বারবার জল তেষ্টা পাচ্ছে আর খানিকটা ক্লান্ত হয়েও পড়েছি তখনি ফুলের উপত্যকা থেকে অনেকটা খাড়া পাহাড়ে চড়তে হল। হঠাৎই ঝোড়ো হাওয়া শুরু হল। আবার জ্যাকেট চাপালাম। গা ছমছম করছে, চারদিক শুনশান, নিচে গভীর খাদ। এই জায়গাটি কালকাতিয়া ধার নামে পরিচিত। হর কি দুন নালা ও যমদ্বার নালা মিলিত হয়েছে। একটা বড় পাথরে ছোট পাথর সাজিয়ে কারা যেন রেখেছে আর তার ওপর ফুল দিয়ে পুজোও করেছে,আমরাও ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম।

এখনও আদ্ধেক রাস্তা বাকি। আর যেতে ইচ্ছা করছে না,এখানেই যদি থাকার জায়গা থাকত ! রোজই ৬/৭ কি.মি.র পর মনের জোরে বাকি পথ যাই। তখন মনে হয় এত কষ্ট করতে কেন বেরোই বাড়ি থেকে? চলার গতি কমে আসছে, ধীরে কিন্তু না থেমে এগিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করলাম। জানি একসময় ঠিক পৌঁছে যাব। তাছাড়া হারিয়ে যাব না বা কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।। বড় বড় গাছ দেখতে পাচ্ছি আবার। একটা সুন্দর ফলস্-এর কাছে একটু জিরিয়ে নিলাম। আবার

চলা। আলুর পরাঠা অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে, কাজু-কিসমিস খেয়ে খিদে ভুলে আছি। এতক্ষণ রাস্তা হেঁটেছি কিন্তু কোন বিপদের মুখে পড়িনি। এই প্রথম আমরা এক বিপজ্জনক স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। দুরন্ত গতিতে 'হর কি দুন' নালা নেমে আসছে,তার ওপর তিনটে কাঠের গুঁড়ি রাখা আছে কোন সাপোর্ট ছাড়াই। এটা ক্রস করে ওপারে আমাদের যেতে হবে। পা পিছলে গেলেই সলিল সমাধি। চমনের হাত ধরে দু'জনে পার হলাম মৃত্যুফাঁদ। খরস্রোতা নদীর পাশ দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর ঘাসের মাঠ পার হলাম। তখনি দূর থেকে টেন্ট দেখতে পেলাম। উফফ্ এ আমি কোথায় এলাম! স্বপ্ন দেখছি না কি! অসাধারণ সুন্দর। মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানালাম অনিন্দ্যকে। সত্যি ভ্যালি অফ গডস্ - ঈশ্বরের আপন দেশ। দূর থেকে দেখা পিকগুলো এখন যেন হাতের নাগালে...

সাঁকো পেরোনো

উপত্যকাটা অনেকটা দোলনার মত ঝুলে আছে যেন। কথিত আছে স্বর্গের পথ গেছে এখান থেকেই, মহাভারতের পঞ্চ পান্ডব এ পথেই স্বর্গ যাত্রা করেন। গাড়োয়ালের উত্তর পশ্চিমে ফতেহ পর্বতের ৩৫৬ মিটার উঁচু এ উপত্যকা। মারিন্দা তাল থেকে সৃষ্ট হর কি দুন নালা থেকে জন্ম যমুনার শাখা নদী টন্স। তাই এর আরেক নাম টন্স ভ্যালি। থাকার জন্য ফরেস্ট রেস্ট হাউস আর জি এম ভি এন-এর বাংলো আছে। ফরেস্ট রেস্ট হাউসেই আমাদের জায়গা হল। কিন্তু খাবার ব্যবস্থা নেই,তাই আমাদের থাকার ব্যবস্থাই হল কেবল,খাবারের নয়। এদিকে আমাদের সঙ্গে কটা বিস্কুট আর এক প্যাকেট ম্যাগি শুধু আছে। ক্ষিদেতে পেট তখন জ্বলছে। চা পানের নিমন্ত্রণ করেছিলেন চন্ডিগড়ের স্কুলের মাস্টারমশাই। বিকালের চা ও রাতের ডিনার ওনাদের সঙ্গেই করলাম। সেদিন ওনার এই উপকার ও আন্তরিকতা এক পরম প্রাপ্তি। ফরেস্ট বাংলো থেকে ভ্যালিটাকে চমৎকার লাগছিল। দরজা খুলেই স্বর্গারোহিনী পিক্, যমদ্বার গ্লেসিয়ার, যার থেকে যমদ্বার নালার উৎপত্তি। এখান থেকে ৪/৫ কিমি ট্রেক করে যেতে হয় গ্লেসিয়ারে। তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য আরও দূরে চলে গেছে তাই ৯ কিমি গেলে তবেই গ্লেসিয়ার দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা তাই যমদ্বার যাবার প্ল্যান বাতিল করলাম। এই ভ্যালির সৌন্দর্য পাগল করে দিচ্ছে। এখানেই দুদিন কাটাব। চন্দ্রালোকে গোটা ভ্যালি প্লাবিত। নির্মেঘ আকাশ,বরফের মুকুট পরা পাহাড়,নদীর জলে চাঁদের প্রতিফলন - যা এতদিন স্বপ্নে দেখতাম তাই আজ সত্যি দেখছি। এত ভাল আবহাওয়া এর আগে কোনদিন পাইনি। তাঁবুর পাশে ক্যাম্পফায়ারের আনন্দে ছোটদের সঙ্গে আমরাও মেতে উঠলাম। কোনও ক্লান্তি নেই আর,সারারাত জেগে প্রকৃতির এই মায়াবী রূপ দেখেও আশ মিটবে না। জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ছে। ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। ফিরে দেখি চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে।

হর কি দুন থেকে দেখা স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গ

www.amaderchhuti.com

৪ঠা জুন। আজ আমরা যাব মারিন্দা তাল। ৩কিমি হেঁটে যেতে হবে। সকালেও টেন্টে ব্রেকফাস্ট করার নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু আমরা আর যাইনি, ম্যাগি খেয়ে বাকিটা প্যাক করে সঙ্গে নিয়ে সাড়ে আটটা নাগাদ বেরলাম। প্রায় পুরোটাই চড়াই। যত এগোচ্ছি হাঁটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পাথর, বোল্ডারের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। হাল্কা বেগুনি রঙের রডোডেনড্রন দেখতে পেলাম। শেষ আধ কি.মি. রাস্তায় কোন সবুজের চিহ্ন নেই, ভীষণই রুক্ষ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। পৌঁছবার পর সব কষ্ট গায়েব। তালের স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে অনেকটা সময় কাটল। মারিন্দা তাল থেকে হর কি দুন নালার জন্ম। মারিন্দা ছাড়িয়ে পর্বতপ্রেমীরা বারাসু পাস ক্রস করে হিমাচলে প্রবেশ করে। 'সীমা'-য় একদল বাঙালি যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল,দেখি তারাও যাচ্ছে এপথে।

মারিন্দা তাল

আজ আমাদের ফেরার কোন তাড়া নেই। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ৩ ঘন্টা কেটে গেল। শুভ্র পাহাড়চুড়া, মেঘেদের লুকোচুরি দেখতে দেখতে যেন হারিয়ে গেলাম। সেভাবে বরফ পেলাম না, অন্যান্য বছর এই সময় প্রচুর বরফ থাকে। দূরে দূরে বরফের সাদা দাগ যেন দেখা যাচ্ছে, আমরা এগিয়ে গেলাম। তারপর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা হল, একটু বরফ ছুঁড়ে খেলাও হল। দুপুরে ফিরে লাঞ্চ করে বিশ্রাম।

৫ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি দূরের পাহাড়গুলো বেশ সাদা দেখাচ্ছে আর নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা বেড়ে গেছে যেন। হর কি দুন থেকে আজ আমরা বিদায় নেব। ছবির মত সুন্দর ভ্যালি ছেড়ে একই রাস্তা ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরার পথ ধরতে হবে, দুদিনের স্মৃতি ডিজিটাল ক্যামেরায় বন্দি আর মনের অনুভূতি ডায়েরির পাতায় রাখা। সীমায় ফিরে ঘন্টা দুয়েক বর্ষণের পর জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়ল রাতে।

৬ ই জুন সকালে উঠে দেখলাম আকাশ পরিস্কার,তবে মেঘ আছে,পরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের আজকেই সাঁকরি পৌঁছতে হবে। পুরলা এলাম দেড়টা নাগাদ,ওখানে লাঞ্চ করে আবার হাঁটা, কারণ জীপ কিছুক্ষন আগে চলে গেছে। ৭ কিমি হাঁটার পর বাকি রাস্তা জীপে গেলাম। রাতটা সাঁকরিতে কাটিয়ে সকালের বাসেই সমতলে ফিরে যাওয়া।

আবার অপেক্ষা হিমালয়ের ডাকের।

পথের ধারে নাম-না-জানা ফুল

হর-কি-দুনের তথ্য || ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

নিজের সংসারকে সুন্দর করে রাখার ছাড়াও ঝুমা ভালোবাসেন অনেকিছুই। তাঁর ভালোলাগা-ভালোবাসার তালিকায় বই পড়া, গান শোনা, নতুন নতুন রান্না করার পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারনেট সার্ফ করে পাহাড়ের ছবি দেখা আর নানা ট্রেককাহিনি পড়া। তাঁর কাছে সবার চেয়ে প্রিয় এই ট্রেকিং-ই। পাহাড়ের ডাকে বছরে অন্তত দুবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনই। আর এই বেড়ানোয় তাঁর সঙ্গী প্রিয়জনদের তালিকায় রয়েছে ডায়েরি আর কলমও।

Rate This : - select -
Total Votes : 8
Average : 4.88
Like 3 people like this. Be the first of your friends. tell a Friend
www.amaderchhuti.com

Post Comments

অসাধারন জায়গার অসাধারন বর্ণণা। ট্রেক-রুট ম্যাপ আলাদা ভাবেনা দিয়ে এক সঙ্গে দিলে ভাল হোত না? হ্যাঁ, তাহলে যদিও আলাদা করে ছেপে নেবার অসুবিধে হতো কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া সম্ভব হতো।

- Subhendu P Chakravarti [2013-07-30]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মুন্সিয়ারির কথা

অদিতি ভট্টাচার্য্য

~ মুন্সিয়ারির তথ্য ~ মুন্সিয়ারির আরো ছবি ~

'মুন্সিয়ারি' - যার মানে বরফে ঢাকা ক্ষেত্র বা জায়গা, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার একটি শহর। নামটা শুনেছিলাম বেশ কিছু বছর আগে। তখন বিশেষ পর্যটক সমাগম হত না সেখানে। যাওয়ার সুযোগ হল দুহাজার এগারো সালের দুর্গাপুজোর সময়ে। চৌকরিতে ভোরবেলা থেকে নন্দাদেবী, ত্রিশূলের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতেই কখন যেন ন'টা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে রওনা দিলাম মুন্সিয়ারির পথে।

বিরথি ফলস্

গাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে যত ওপরে উঠতে লাগল হিমালয় ততই নতুন নতুন রূপে ধরা দিতে লাগল চোখের সামনে। তার বিশালত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হতে লাগল বার বার। মনে হচ্ছিল যেন কোন অসীমের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছি আমরা। সে এক অদ্ভূত অনুভূতি। রাস্তার একপাশে পাইন, স্পার, রডোডেনড্রনের ঘন বন তো অন্য পাশে অতলস্পর্শী খাদ। কোথাওবা সঙ্গী সগর্জনে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী রামগঙ্গা। একবার সুবিধে মতো জায়গায় গাড়ি থামিয়ে পায়ে পায়ে নেমে গেলাম রামগঙ্গার পাথর ভরা তীরে। যুগ যুগ ধরে কত নুড়ি পাথরকে ক্ষইয়ে, কত পাথরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে সবুজ রঙের জলের স্রোত ছড়িয়ে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলছিল ছবি তোলা আর পাইনের কোন কুড়োনো।

দেখতে দেখতে পৌঁছলাম মুন্সিয়ারির কিছু আগে বিরথি ফলসে। একশ পঁচিশ মিটার ওপর থেকে ধবধবে সাদা ফিতের মতো নেমে এসেছে বিরথি জলপ্রপাত। ব্যাকগ্রাউণ্ডে যার গগনচুম্বী সবুজ হিমালয়। সত্যিই ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয় বিরথিকে। ইচ্ছে করলে নুড়ি পাথর ভর্তি এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে জলের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু আমার সে সাহস হয়নি কারণ রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল। বিরথির ঠিক পাশেই অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল। সেখান থেকে আলুর পরোটা, আচার আর চা সহযোগে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আবার গাড়িতে চড়ে বসা। মন ততক্ষণে অধীর মুন্সিয়ারি পৌঁছনোর জন্যে।

মুন্সিয়ারি যাবার আর ওখান থেকে ফেরার সময়ে প্রতিটা গাড়ি মুন্সিয়ারি থেকে কিছুটা ওপরে অবস্থিত একটা স্পট অবশ্যই ছুঁয়ে যায় তা হল কালামুনি টপ - এক সাধকের আশ্রম, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাকালীর মন্দির। এই নিয়মের অন্যথা কেউ করে না বলেই শুনলাম আমাদের গাড়ির ড্রাইভার অশোকভাইয়ার কাছে। প্রতিটা গাড়ি অল্পক্ষণের জন্যে হলেও এখানে থামে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আকাশে অল্প মেঘও ছিল। কাজেই তাড়াতাড়ি মন্দির দর্শন সেরে আবার গাড়িতে চড়ে বসলাম। মুন্সিয়ারিতে যখন পৌঁছলাম বৃষ্টি পড়ছে। হোটেলের কর্মচারীরা বলল রাতে জোর ঠাণ্ডা পড়বে কারণ দূরে পাহাড়ে তুষারপাত হচ্ছে আর কাল সকালে আকাশ ঝকঝকে থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

ভোরের আলোয় পঞ্চচুল্লি

পরেরদিন সূর্য উঠতে না উঠতেই সোয়েটার, চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে সোজা হোটেলের ছাদে। ঠিকই বলেছিল ওরা - আকাশ একদম পরিষ্কার। চোখের সামনে রোদ্দুরে ঝলমল করছে বরফে মোড়া পঞ্চ চুল্লি। না, আকাশের গায়ে আটকানো তিনকোণা শৃঙ্গ নয় শুধু, মনে হল যেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালাকায় পাঁচজন। এই সেই পঞ্চচুল্লি যাদের দেখার জন্যে এতদূরে ছুটে আসা। যাদের দিকে শুধুই চুপচাপ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মহাপ্রস্থানে যাবার আগে পঞ্চ পাণ্ডব এখানেই রান্না করে খেয়েছিলেন। শুধু পঞ্চচুল্লি নয় দর্শন পেলাম হংসলিঙ এবং নাম না জানা আরও অনেক শৃঙ্গের। দর্শন পাওয়াই বটে। ওখানেই শুনেছিলাম যে এরকম ঘটনাও ঘটেছে সাতদিন একটানা থেকেও একবারও এক মুহূর্তের জন্যে পঞ্চচুল্লি দেখতে না পাওয়া।

বেলার দিকে বেরোলাম মুন্সিয়ারি ঘুরে দেখতে। প্রতিটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া চাষের জমি। যেখানে বেশী চোখে পড়ল আলু আর রাজমার খেত। এই দুটোই ওখানকার প্রধান ফসল। অনেক অনেক সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম নন্দাদেবীর মন্দির দেখতে। পাহাড়ের মাথার ওপর অল্প একটা গোল জায়গায় ছোট্ট সুন্দর মন্দির, হিমালয় যাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তখন নবরাত্রি চলছিল, মন্দির তাই

www.amaderchhuti.com

সুসজ্জিত। এত সুন্দর, শান্ত পরিবেশ যে এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে গৌরীগঙ্গা নদী, মিলাম গ্লেসিয়ার থেকে যার উৎপত্তি। গেলাম দ্বারকোট গ্রামে। দেখলাম ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা চলছে। এখানকার বাসিন্দারা আঙ্গোরা খরগোশ পোষে উলের জন্যে।

পরেরদিন মুন্সিয়ারি থেকে বিদায় নেবার পালা। সেদিন যেন পঞ্চ চুল্লি আরও সুন্দর, আরও অপরূপ। গাড়িতে অশোকভাইয়া বলল যে আমাদের আটকানোর চেষ্টা করতেই বোধহয় পঞ্চ চুল্লি আজ এইভাবে ধরা দিয়েছে, নয়তো এরকম ভিউ পাওয়া নাকি নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার। আবার কালামুনি টপ যাওয়া। সেখানেও সেদিন পঞ্চ চুল্লি সত্যিই ছিল স্বমহিমায় ভাস্বর। দুচোখ ভরে তাকে দেখে নিয়ে নামতে শুরু করলাম।

নন্দা দেবী মন্দির

www.amaderchhuti.com

~ মুন্সিয়ারির তথ্য ~ মুন্সিয়ারির আরো ছবি ~

অদিতির পড়াশোনা সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে। কর্মসূত্রে আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। বই পড়তে ভালোবাসেন। ভ্রমণ, ছবি তোলা, এম্ব্রয়ডারির পাশাপাশি লেখালিখিতেও সমান উৎসাহী। নানান ওয়েব ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতই।

Rate This : - select -
Total Votes : 5
Average : 4.60

Like One person likes this. Be the first of your friends.

tell a Friend

ঐতিহ্যের শহর ইস্তানবুলে

কাকলি সেনগুপ্ত

~ ইস্তানবুলের তথ্য ~ ইস্তানবুলের আরো ছবি ~

গত ৩১ মে দুপুর দু'টোর সময় আমরা ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে নামলাম। তার আগের রাত থেকেই তাক্সিম স্কোয়ারে পুলিশের অতি সক্রিয়তা শুরু হয়ে গেছে। ঘুমন্ত বিক্ষোভকারীদের তাঁবু থেকে বের করে এনে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, পেপার স্প্রে নিয়ে পুলিশ তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু সেদিন বিকেলে আমরা ইস্তানবুলের ঐতিহাসিক অঞ্চল "সুলতান আহমেদ স্কোয়ার"-এ পৌঁছে দেখলাম সেখানে বিক্ষোভের ছোঁয়ামাত্র লাগেনি। স্থানীয় আর বিদেশি মানুষের ভিড়ে পুরো জায়গাটা জমজমাট হয়ে আছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্তের নমাজ শুরু হয়ে গেল। সুলতান আহমেদ মসজিদ বা নীল মসজিদ থেকে প্রথম সুর উঠছে। আশপাশের সমস্ত মসজিদের মিনারেট তার রেশ ধরে প্রার্থনা করছে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর ধ্বনি-প্রতিধ্বনির খেলা। কিন্তু একটু খটকা লাগলো। আমাদের দেশে যে সুরে-ভাষায় আজান দিতে শুনেছি, এ প্রার্থনার সুরটা তেমন তো নয়! পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি তুর্কীস্থান হল পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম প্রধান দেশ যেখানে আরবির বদলে স্থানীয় ভাষা তুর্কীতে আজান দেওয়া হয়।

সুলতান আহমেদ মসজিদ - নীল মসজিদ

www.amaderchhuti.com

আজানের সুর ধরে আমরা হিপোড্রোমে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একদল স্কুলপড়ুয়ার ভিড় - খুব হুল্লোড় করছে তারা। আমার ছেলে পাবলোকে দেখে তারা উৎসাহ করে এগিয়ে এলো - ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছো? নিউ দিল্লি?" পাবলোর বয়সীই হবে ওরা। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ভারতে দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা ক'জন তুর্কীস্থান সম্বন্ধে জানে! আমরা এলাহাবাদে থাকি; তাই বললাম, " নিউ দিল্লি নয়, তবে তার কাছাকাছি।" আবার প্রশ্ন এলো, "তবে কি তোমরা আগ্রায় থাকো?" এবার আমরা বাক্যহারা!

এবছর জুনের শুরুতে আমরা চারদিন কাটিয়ে এলাম তুর্কীস্থান বা তুর্কী-র অন্যতম প্রধান শহর ইস্তানবুলে। এই শহরের মজাটা হল এর কিছু অংশ ইউরোপে, বাকিটা এশিয়ায়। এখানকার মানুষজনের মধ্যেও তার প্রভাব রয়েছে। এশিয়ার মানুষদের ব্যবহারের উষ্ণতা ও সহজাত মেলামেশা করার স্বভাব ওদের রয়েছে। যেখানেই গেছি শুনেছি, " ফ্রম ইণ্ডিয়া? ওয়েলকাম"। আবার ইউরোপীয়দের সহজাত নিয়ম মানার অভ্যাসটাও ওদের মধ্যে রয়েছে। ট্রামে-বাসে দেখেছি সাধারণ লোকজন নিয়ম মেনে চলে, ধাক্কাধাক্কি নেই, এবং বিদেশিদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। ইস্তানবুল খুব আধুনিক মনোভাবের শহর। লোকজন ইংরেজি বোঝে ও বলতে পারে। ইউরোপের যে কোনো শহরের মতোই এখানে প্রচুর কাফে-বার, আর সেগুলো সবসময়ই জমজমাট হয়ে আছে।

জুনের শুরুতে ইস্তানবুলে তখন চমৎকার আবহাওয়া। ঝকঝকে নীল আকাশ, মাঝেমাঝেই মারমারা সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসছে। আর বছরের এই সময় দিন বেশ লম্বা বলে অনেকটা বেশি সময় পাওয়া যায় বেড়ানোর জন্য। পয়লা জুন প্রথমেই আমরা নীল মসজিদে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি অবাক করা ব্যাপার - পুরুষরা মসজিদে ঢোকার জন্য স্কাল ক্যাপ বা কিস্তি টুপি পড়েনা। আর মহিলাদেরও মসজিদে প্রবেশ নিয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তুর্কী বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে এটা সম্ভব হয়েছে। আমিতো উৎসাহে টগবগ করছি। আমার নিজের দেশের মসজিদে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। নিজেদের জুতো থলিতে ভরে (কী কাণ্ড!) আমরা নীল মসজিদে ঢুকলাম। ভিতরের সজ্জা নীল ইজনিক টালি দিয়ে তৈরি বলেই এর নাম নীল মসজিদ। চমৎকার! সুন্দর। কিন্তু ভারতে সুলতান ও মুঘল সম্রাটদের সময় যে সমস্ত মসজিদ-প্রাসাদ বা অন্যান্য স্থাপত্য তৈরি হয়েছে, তার তুলনায় কিছুই নয়। ভারত থেকে নাদির শাহ-র লুঠ করে নিয়ে যাওয়া একটি সিংহাসন (ময়ূর সিংহাসন কী!?) তোপকাপি প্রাসাদে রাখা আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য আর সৌন্দর্যে ওটোমান সুলতানদের কোনো সম্পদ তার তুলনায় আসেনা। দিল্লি-আগ্রা-রাজস্থানের প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিদেশিদের ঘুরতে দেখে আমার বারবার মনে হত এরা কেন ভারতে আসেন? কিসের আকর্ষণে? নীল মসজিদ বা ওটোমান সুলতানদের প্রাসাদ দেখে বুঝলাম তুর্কীর ইসলামিক স্থাপত্য দেখে যদি কেউ মুগ্ধ হয়, তাকে ভারতে আসতেই হবে প্রাচ্য শিল্পের সর্ব্বোত্তম প্রকাশরূপটি উপলব্ধি করতে।

আমার অবশ্য সুলতান আমলের স্থাপত্যের থেকে বাইজেনটাইন আমলের (৩৩০-১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) স্থাপত্যশিল্প অনেক বেশি ভালো লেগেছে। শুধুমাত্র কলোসিয়াম দেখার জন্য যেমন রোমে যাওয়া যায়, তেমনি শুধুমাত্র আয়া সোফিয়া (Hagia Sophia) দেখার জন্য একবার অন্তত ইস্তানবুল যাওয়া উচিত। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে আবেগে গলার কাছে অদ্ভুত কান্না দলা পাকায়। আয়া সফিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার একই অনুভূতি হয়েছে। মানুষের সৃষ্টি ওই শিখরে উঠতে পারে! ৫৩৭-১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ এটি ছিল অর্থোডক্স চার্চের বেসিলিকা। এখানে বাইজেনটাইন স্টাইলের মোজেইক কাজ অপূর্ব সুন্দর। ওই বিশাল মাপের সৃষ্টিতে যিশু ও অন্যান্যদের মুখে কী অসাধারণ মানবিক অভিব্যক্তি! ১২০৪-১২৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের অনুগামীরা এই বেসিলিকার ওপর হামলা চালিয়েছে। ১৪৫৩ তে সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ রাতারাতি এই বেসিলিকাকে মসজিদে বদলে দেন। অসাধারণ সব মোজেইক-ফ্রেসকোগুলো ঢেকে দেওয়া হয়। এত কিছুর পরেও আয়া সোফিয়া অপূর্ব স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

'দ্য ভিঞ্চি কোড'-এর লেখক ড্যান ব্রাউনের নতুন বই 'ইনফেরনো' যাঁরা পড়ে ফেলেছেন তাদের আয়া সোফিয়া থেকে একবার সিস্টার্ন-এ যেতেই হবে। সেখানেই যে এই উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স! মাটির তলায় সিস্টার্ন বা জলাধার। এতে নতুনত্ব কী? তাহলে সেখানেই নেমে পড়া যাক। কী আশ্চর্য! রয়েছে আস্ত একটা বেসিলিকা। ৩৩৬ টি অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য করা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই বেসিলিকা। ৫৩২ খ্রিস্টাব্দে বাইজেনটাইন সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান এই বেসিলিকাকে জলাধার বা সিস্টার্ন বানিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। প্রাসাদের জল সরবরাহ হত এখান থেকেই। আশা করছি, হলিউড খুব শীঘ্রই এই উপন্যাস নিয়ে সিনেমা বানিয়ে ফেলবে। আর সেই সুযোগে আমাদের আবার "আয়া সোফিয়া" ও "বেসিলিকা সিস্টার্ন" দেখা হয়ে যাবে।

ওটোমান আমলে চোরা চার্চটিকেও মসজিদে বদলে ফেলা হয়েছিল। তবে খুব ছোট চার্চতো; বিশেষ নজরে পড়তনা। তাই হয়ত ভাঙচুরটাও একটু কম হয়েছে। এখানে মোজেইকের কাজ খুব সুন্দর। ফ্রেস্কোগুলোও যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছে।

এবার ইস্তানবুলের অন্য আকর্ষণের কথা বলি - এখানকার খাওয়া-দাওয়া অতি চমৎকার। তুর্কিশ দোনের কাবাব তো আজ পৃথিবী বিখ্যাত। আর এক মিষ্টি আছে, বাকলাভা - দেবভোগ্য মিষ্টান্ন। আমার ছেলে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে চাঙ্গা করতে খুব কাজে লেগেছে। অন্যান্য খাবার আমাদের মতন - তবে মশলা কম। ভারতীয় উপমহাদেশের মতো মশলার ব্যবহার বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও হয়না! এই খাবারের প্রসঙ্গেই আরেক অভিজ্ঞতা হল। একটি রেস্টুরেন্টে আমরা নিয়মিত লাঞ্চ করতাম। তৃতীয় দিনেও আমরা যখন গরুর মাংসের কাবাব অর্ডার করলাম, অবাক হয়ে আমাদের প্রশ্ন করলো, "আর ইউ ফ্রম পাকিস্তান?"

স্কুলে থাকার সময় ইতিহাসে পড়তাম "হাজার বছরের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য" আর তার রাজধানী "কনস্ট্যানটিনোপল"। কোথায় যে সেই জায়গাগুলো ভালো

আয়া সোফিয়া - ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জাস্টিনিয়ানের সময় তৈরি ব্যাসিলিকা

ভূগর্ভস্থ জলাধার - বেসিলিকা সিস্টার্ন

করে জানা হত না। পাড়ার ফাংশানে আবেগঘন নজরুলের কবিতার আবৃত্তি শুনেছি "কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই"। কিন্তু এই কামাল ভাই কে, তিনি কী কামাল করেছে - সেই খবর ক'জন বাঙালি নিয়েছেন! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা মনে হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না - এই কামাল হলেন কামাল আতাতুর্ক, আধুনিক তুর্কীর প্রথম রাষ্ট্রপতি। আজকের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশটা তৈরির পেছনে এই মানুষটির বিরাট ভূমিকা ছিল। আর সেদিনের কনস্ট্যানটিনোপল-ই আজকের আধুনিক ইস্তানবুল। আমরা ওদের সম্পর্কে তেমন না জানলেও, ওরা কিন্তু আমাদের কথা অনেক বেশি করে জানে। দোকানে "কোলাভেরি ডি" বাজতে শুনেছি; পার্কে বসে শুনেছি দুই যুবক "তারে জমিন পর" নিয়ে আলোচনা করছে। হয়তো ঐতিহ্য, হয়তো বাণিজ্যের কারণেই ভারত ওদের কাছে আজও এত প্রাসঙ্গিক, এত প্রিয়। দোকানে দেখেছি ভারতীয় শাল, মশলার পাশেই রয়েছে ভারতীয় কাজল। একই ঐতিহ্যের অধিকারী এই দুই দেশ। বারবার মনে হয়েছে ওরা কত যত্ন করে তাকে রক্ষা করছে, আমরা আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরেকটু কি যত্ন নিতে পারি না? আমাদের সন্তানরা হয়তো সেই সময়টা দেখতে পাবে, যখন ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের যত্ন নেওয়া হবে, সাধারণ মানুষ তার মূল্য বুঝতে পারবে। এত সুন্দর ঐতিহ্যবাহী একটা শহর, একটা দেশে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মত সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে এইটুকু ভাবতে বা আশা করতে সত্যিই বড় ইচ্ছা করে।

www.amaderchhuti.com

নীল মসজিদের ভিতরে

~ ইস্তানবুলের তথ্য ~ ইস্তানবুলের আরো ছবি ~

মফস্বল শহর বালীতে বড় হয়ে ওঠা কাকলি সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছেন ১৯৯৭ সালে। তারপর নানা জায়গা ঘুরে ২০০৪ সাল থেকে থিতু হয়েছেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে - এলাহাবাদে। গল্প করে ও গল্প বলে লোকজনকে বিরক্ত করার জন্য খ্যাতি আছে। বেড়ানোর সাথে সাথে দেশ-বিদেশের খাদ্য ও পানীয়র ব্যাপারে সমান আগ্রহী।

একটুকরো ব্রাসেলস

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

~ তথ্য - ব্রাসেলস ‖ ব্রাসেলসের আরো ছবি ~

অনেকদিন আগের কথা। এক ধনী ব্যবসায়ীর আড়াই বছরের ছোট্ট ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল ব্রাসেলস শহরে। আনাচে কানাচে খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত যখন তাকে পাওয়া গেল তখন সে শহরের এক প্রান্তে ফোয়ারার জলের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে প্রস্রাব করছিল। তার বাবা তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দেই সেই জায়গায় বানিয়ে ফেললেন ব্রোঞ্জের আস্ত একটা মূর্তিই ঠিক যেমনটি তাকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তারপর বেশ কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। প্রচলিত কথা বলে, যুদ্ধের সময়ে দেবদূতের মতো সেই নগ্ন শিশুমূর্তি বাঁচিয়ে ছিল এই শহরের মানুষজনকে। ১৬১৯ সালে শিল্পী হিয়েরোনিমাস নির্মিত এই মূর্তিটি চুরি গিয়েছেও বেশ কয়েকবার এমনই এর জনপ্রিয়তা। প্রতিবারই নতুন করে বানানো হয়েছে মূর্তিটি। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে এই স্ট্যাচুটিকে ঘিরে সারা বছর ধরেই চলে নানা উৎসবের পালা। উৎসবের দিনে নানা পোষাকে সেজে ওঠে এই কিংবদন্তী শিশু। গ্র্যান্ড প্লেসের সিটি মিউজিয়ামে গেলেই দেখা যায় এই ছোট্ট মূর্তিটির অজস্র পোষাকের সম্ভার।

এখানে আসার আগেই অনেকবারই শুনেছিলাম এই আশ্চর্য শিশু মূর্তিটির কথা। ব্রাসেলসে পৌঁছেই তাই কৌতুহল মেটাতে প্রথমেই চলে এসেছিলাম “রু দে লেতুভ” আর “রু দে গ্র্যান্ড কারস”-এর সংযোগস্থলে অবস্থিত ‘ম্যানিকেন পিস’ নামক ৬১ মিটার দীর্ঘ সেই শিশু মূর্তিটি দেখতে। এখন সেখানে দাঁড়িয়েই নানা গল্পকথা শুনছি গাইডের মুখে আর মূর্তিটিকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা দেখতে দেখতে মনে পড়ছে ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা হাজারো সত্যিকারের নগ্ন শিশুদের কথা, যাদের দিকে ফিরেও তাকায় না মানুষ।

গল্প শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে দেখি অনেকটা সময় কেটে গেছে। 'ম্যানিকেন পিস'-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আশপাশের দোকানগুলোয় সাজানো বটল ওপেনার, ফ্রিজ ম্যাগনেট, চাবির রিং, আরও হরেক রকমের ম্যানিকেন পিসের সাজানো সম্ভার দেখতে দেখতে এবারে এগোই গ্র্যান্ড প্লেস বা গ্রেট মার্কেটের দিকে।

ব্রাসেলসও ইতিহাসের শহর। কিন্তু এই ইতিহাস মূক নয়, বরং আধুনিকতার রঙমিশেলে অতীত বড় জীবন্ত এই শহরে। ব্রাসেলস শব্দের ডাচ অর্থ "জলা জায়গার ওপর বাড়ি"। সত্যি একসময় এটি নীচু জমির ওপর ছোট্ট একটি শহর ছিল। সেটা প্রায় দশম শতাব্দীর আশেপাশে এক সময়ের কথা। কালক্রমে শহর বাড়তে বাড়তে আজকের এই সাজানো গোছানো ঝকঝকে বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছে। একদিনে পুরো শহর ঘুরে ফেলা একেবারেই সম্ভব নয়।

ব্রাসেলস শহরের প্রাণকেন্দ্র সেন্ট্রাল স্কোয়ার বা গ্র্যান্ড প্লেস। গিল্ড হাউস, সিটি টাউন হল আর ব্রেডহাউস দিয়ে ঘেরা এই গোলাকৃতি জায়গাটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত। প্রাচীনত্বের দিক থেকে তো বটেই এমনিতেও স্থানটির আভিজাত্যই আলাদা। প্রত্যেক দু'বছর অন্তর “ফ্লাওয়ার কার্পেট” দিয়ে সাজানো হয় সুবিশাল এই চত্বর। আমাদের অবশ্য ফ্লাওয়ার কার্পেট দেখার সৌভাগ্য হয়নি তবে গোটা জায়গাটা তখন ছোট ছোট বেগুনি ফুলের রঙবাহারি টব দিয়ে সাজানো ছিল। সুন্দর এই চত্বরটা ঘিরে দোকানের সারি - চিজ, চকোলেট, কফিশপ, খাবারের দোকান, বিয়ার শপ আরও কত কী।

টাউন হলের গথিক স্থাপত্যের টাওয়ারটি দেখে ভুল করে ভাবছিলাম বোধহয় কোন প্রাচীন চার্চ বা কাসেল। আসলে সেটাই টাউন হল। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত টাউন হলটির যেদিকেই তাকাই অতীত যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। মাঝখানের উন্মুক্ত জায়গাটি ঘিরে রয়েছে বিশালাকৃতি হলগুলি। পাথরের তৈরি বড় বড় ইঁট জুড়ে তৈরি মেঝের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে। পুরোনো হলগুলোর নীচের তলায় এখন নানারকম দোকান, রেস্তোঁরা আর ছোট ছোট কাফে আর ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকান। দেখলাম বেশ কয়েকটা বেলজিয়ান চকোলেটের দোকান রয়েছে। একটা কাফের রঙিন ছাতার তলায় বসে ধোঁয়া ওঠা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আশপাশে তাকিয়ে দেখছি প্রাচীন আর আধুনিক বিচিত্র এই শহরকে - নানান দেশের পর্যটকদের ভিড় থেকে ভেসে আসছে বিভিন্ন ভাষায় চেনা-অচেনা শব্দ-বাক্য, দোকানগুলিতে তাল মিলিয়ে চলছে বেচাকেনার পালা, ওরই মাঝে এক শিল্পী তার ক্যানভাসে আপন মনে বোলাচ্ছেন তুলি, ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে মার্কেট প্লেসের রঙ-ছবি।

হাতে সময় খুব কম। এক ঝলক ঘুরে নিলাম অ্যাটোমিয়াম থেকে। ১৯৫৮ সালে ব্রাসেলস-এর মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার। সেই সময় অ্যাটোমিয়াম নামক একটি স্ট্রাকচার গড়ে তলা হয়। এটি দেখতে একটি অণুর মত। আশ্চর্য কারিগরি দেখে বেশ অবাক হলাম।
ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। একেবারেই দেখা হল না দুটি বিখ্যাত মিউজিয়াম - রয়্যাল মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস আর বিখ্যাত কমিক চরিত্র টিনটিনকে নিয়ে করা কমিক মিউজিয়াম। বেশ আফশোষই লাগছিল। রয়্যাল প্যালেসের এক অংশ এখন হোটেল। সেখানে লাঞ্চ সেরে ফেরার পথ ধরলাম।

~ তথ্য - ব্রাসেলস ‖ ব্রাসেলসের আরো ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মহুয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন।

Rate This : - select -
Total Votes : 8
Average : 4.38

Like Mahasweta Ray and 8 others like this.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

I shall never forget the place. Thank you for make me remember.

- Kaushik Modak [2013-07-24]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

কোণার্কের সূর্যমন্দিরে

হুমায়ূন কবীর ঢালী

চব্বিশ এপ্রিল আমার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব হবে জানিয়ে আগেই মেল করেছিল সরোজিনী সাহু। সরোজিনী ভারতের অন্যতম নারীবাদী লেখক। ওড়িশায় বাস। যার সহযোগিতায় আমার বইটি ওড়িশা থেকে প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে। যাহোক, চব্বিশ তারিখের কথা শুনে ভারতীয় ভিসা পেতে তৎপর হয়ে উঠলাম। কিন্তু ভারতীয় ভিসা পেতেও আজকাল বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। সে প্রসঙ্গে আর নাইবা গেলাম। বেশ কয়েকবার (কয়েকদিন বলাই সমীচীন হবে) চেষ্টার পর ইন্টারনেটে ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার তারিখ এবং যথাসময়ে ভিসাও মিলল।

বিশ এপ্রিল কলকাতা, এবং বাইশ এপ্রিল ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর গেলাম। ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি রাজ্য ওড়িশা। ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ওড়িশা একেক সময় একেক নামে পরিচিত ছিল - কলিঙ্গ, উৎকল, কোঙ্গদ, উদ্রদেশ ও উড়িষ্যা। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ওড়িশা রাজ্য। নীল সাগর ও বেলাভূমি, পাহাড়ি নির্ঝর, সবুজ বনানী, ডলফিনের বাস চিলিকা হ্রদ ও জলপ্রপাত। এসবের পাশাপাশি এখানকার প্রাচীন কারুকার্যময় মন্দিরগুলো পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বিশেষ করে কোণার্ক-এর সূর্যমন্দির, ভুবনেশ্বরের রাজারানি মন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির খুবই বিখ্যাত।

www.amaderchhuti.com

কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর ট্রেনে ছয় ঘন্টার পথ। যদিও জনশতাব্দীতে লেগেছিল প্রায় সাত ঘন্টা। ভুবনেশ্বর সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌঁছলাম রাত সোয়া নয়টায়। পন্ডিত আচার্য এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সাথে তার কয়েকজন বন্ধু ও সহযোগী। ফুল আর উত্তরীয় পরিয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বাংলাদেশের একজন লেখকের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা দেখে খুব ভালো লাগল। পন্ডিত আচার্যর গাড়িবহর আমাকে গ্রিডকো গেস্ট হাউজে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। কেননা, তখনো সরোজিনী এসে পৌঁছায়নি। তার পৌঁছাতে পৌঁছাতে আগামীকাল সকাল। রাতে উড়িষ্যার বেশ কয়েকজন লেখক এলেন। উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আড্ডা-আলাপে রাত প্রায় বারটা বাজল। ভোর সাতটায় দরজার কড়া নড়ল। দরজা খুলে দেখি সরোজিনী সাহু দাঁড়িয়ে আছেন।

"গুড মর্ণিং। রাতে ঘুম কেমন হলো?" - বাংলা আর ওড়িয়ার মিশেলে সরোজিনী জানতে চাইলেন।

"খুব ভালো হলো।"

"আমাদের রাত কেটেছে গাড়িতে। ভোর ছয়টায় এসে ভুবনেশ্বর পৌঁছলাম। আমরা আপনার পাশের রুমে আছি। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন। আমরা বেরোবো। পুরীতে যাব।"

সিডিউল আগেই দেওয়া ছিল। তৈরি হয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ভুবনেশ্বর থেকে দক্ষিণে পুরীর দূরত্ব ষাট কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে পুরীর অবস্থান। তার আগে কোণার্ক শহর। সেখানে অবস্থিত সূর্যমন্দির। সমুদ্র থেকে তিন কিলোমিটার ভেতরে। পুরী থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গাড়িতে ওঠার পর জগদীশদা (জগদীশ মোহান্তি, ভারতের বিখ্যাত লেখক, সরোজিনীর স্বামী) জানালেন, পুরীতে যাওয়ার আগে আমরা সূর্যমন্দির পরিদর্শনে যাব। রাজধানী পেরিয়ে কোণার্কের সড়কটা খুব চওড়া না হলেও যানজটমুক্ত থাকায় সমান গতিতে গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। সড়কের দুপাশে সমতল ফসলি জমি। নানারকম সবজি আর সোনালী ধানের শীষে চোখ জুড়িয়ে যায়। এসব দেখতে দেখতে কখন কোণার্ক চলে এসেছি খেয়াল নেই। সরোজিনী যখন বলল, "ঢালী, কোণার্ক চলে এসেছি। নামতে হবে।" – আমার ঘোর কাটল। প্রধান সড়ক থেকে সূর্যমন্দির পায়ে হাঁটার পথ।

তিনশ গজ হবে। মন্দিরের গেটে গিয়ে থামতে হলো। টিকিট কাটতে হবে। জগদীশদা টিকিট কাটলেন। মন্দিরে ঢুকতে চওড়া সড়ক। সড়কের দুপাশে সবুজ পরিপাটি বাগান। এরপর মন্দিরে ঢোকার প্রধান গেট। সূর্যমন্দির। একসময় মন্দিরটি সমুদ্রের পারে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব এখানে সূর্য উপাসনা করে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। মন্দিরটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঐতিহ্য প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও ইউনেস্কো নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের (১০৭৮-১৪৩৪) রাজা প্রথম নরসিংহদেব (১২৩৮-১২৬৪) দ্বারা নির্মিত। বারশ শিল্পী বার বছরে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মূল মন্দিরটি বহু শতাব্দী আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আমরা যে মন্দিরটি দেখতে পাই সেটি মুল মন্দিরের জগমোহন ও ভোগমন্ডপ অংশ। পুরো মন্দিরটি পাথরের খাঁজ কেটে তৈরি করা হয়েছে। কারুশিল্পের চমৎকার নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরটির উচ্চতা ২২৮ ফুট। মন্দিরটির ডিজাইন সম্বন্ধে উড়িষ্যার সরকারি ওয়েবসাইটে তথ্য দেওয়া আছে, The entire temple was designed in the shape of a colossal chariot with seven horses and twenty four wheels, carrying the sun God, Surya, across the heavens. Surya has been a popular deity in India since the Vedic period.

www.amaderchhuti.com

উপাস্য সূর্যমূর্তিটি সম্রাট মুকুন্দদেব পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের কারুকার্যে তিন রকমের সূর্যদেবতা রয়েছে। দক্ষিণ পাশের সূর্যদেবতাকে 'উদিতসূর্য', যার উচ্চতা ৮.৩ ফুট, পশ্চিমদিকের সূর্যদেবতাকে 'মধ্যাহ্ন সূর্য', যার উচ্চতা ৯.৬ ফুট এবং উত্তর দিকের সূর্যদেবকে 'অস্ত সূর্য', যার উচ্চতা ১১.৫ ফুট, আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুরো সূর্যমন্দিরটি একটি রথের মতো। মন্দিরে আছে ২৪ টি চাকা। প্রতি চাকায় আটটি স্পোক। একেকটির ব্যাস ৯.৯ ফুট। মন্দিরের দক্ষিণদিকে কারুকার্যে খচিত রয়েছে দুটি যোদ্ধা ঘোড়া। প্রতিটি দৈর্ঘে ১০ ফুট ও প্রস্থে ৭ ফুট। পূর্ব দিকে মন্দিরে প্রবেশের মুখে দুপাশে দুটি ঐশ্বর্যপূর্ণ সিংহ দুটি হাতির ওপর চেপে আছে। প্রত্যেকটি সিংহ ও হাতির মূর্তি একটি পাথরে তৈরি। এটি দৈর্ঘে ৮.৪ ফুট, প্রস্থে ৪.৯ এবং উচ্চতায় ৯.২ ফুট। প্রতিটি সিংহ ও হাতির ওজন ২৭.৪৮ টন। এটি মন্দিরের প্রধান গেট। এছাড়া মন্দিরের গায়ে অসংখ্য দেবদেবী, জীবজন্তু, নর-নারীর কারুকার্য শোভিত। তবে অধিকাংশ মূর্তিরই ক্ষয়িষ্ণু অবয়ব। আগের সেই দেহবল্লরী যেমন শোভা পাচ্ছে না, তেমনি মন্দিরটিও প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্যের ক্ষয়িষ্ণু নির্মাণ দর্শন করছে পর্যটকরা।

মন্দির পরিদর্শন শেষেও বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে না। ফিরে ফিরে দেখতে ইচ্ছা করে। মন্দিরের শিল্পকর্ম নিয়ে যেকোনো শিল্পপ্রেমী মন ভাবনার অতলে ডুবে যাবে বারবার।

~ কোণার্কের তথ্য || কোণার্কের আরো ছবি ~

পেশায় সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হুমায়ুনের অবাধ ও সাবলিল বিচরণ শিশুসাহিত্য, কথাসাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যে। লেখালেখির শুরু লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে শাপলা দোয়েল ফাউণ্ডেশনের ট্রাষ্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য হুমায়ুন বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স এসোসিয়েসনসহ অনেক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাপ্রকাশের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বেও নিয়োজিত আছেন। এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে চল্লিশটিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

Rate This : - select -
Total Votes : 26
Average : 4.69

Like Kakali Sengupta and 17 others like this.

tell a Friend

প্রকৃতির কাছাকাছি

রফিকুল ইসলাম সাগর

রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলেছে সিলেটের উদ্দেশে। শ্রীমঙ্গল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এই রেল পথ অসম্ভব সুন্দর, আশপাশে শুধুই চা-বাগান। যদিও এখন সবই অন্ধকার, শুধু রেলপথের ওপর ট্রেনের আলো আর মাঝে মাঝে আলো-অন্ধকারে একেকটা স্টেশন যেন ভেসে উঠছে আঁধার সমুদ্রে।

মাধবকুণ্ড ঝরণা

সাতটায় সিলেট পৌঁছে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। মাজার জিয়ারতের কাছেই একটি হোটেল ভাড়া করলাম থাকার জন্য। সেখান থেকে মাধবকুণ্ড প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে। মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় মাধবকুণ্ড। এর আগে কখনও আমার যাওয়া হয়নি। শুনেছি মাধবকুণ্ডের ঝরনা খুব সুন্দর। মাধবকুণ্ড যাব বলতেই ফিরোজা খালা হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন,এই বৃষ্টি-বাদলার দিন না যাওয়াই ভাল। আমি, ইভা, ফাহিম ও বাঁধন ছাড়লাম না। বললাম, গিয়ে দেখোই না, বর্ষাতেই তো মাধবকুণ্ডের ঝরনা পেখম মেলে। একটা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভাড়া করে সোজা চলে গেলাম মাধবকুণ্ড। যাওয়ার পথে একটি ফেরিতে করে পার হতে হয়েছে। বর্ষায় অনেক জায়গায় পথ ছুঁই ছুঁই পানি। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল অটোরিকশায় থাকতেই। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ১০ টাকার টিকিট কেটে মাধবকুণ্ড পর্যটন কেন্দ্রে ঢুকলাম। বড় বড় গাছ, ভেজা পাখি, পাহাড় সব মিলিয়ে দারুণ ভাল লাগছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও কিসের শব্দ যেন কানে আসছিল। বাঁয়ে ঘুরতেই ঝরনা দেখতে পেলাম। বেশ বড় কলেবর নিয়ে পূর্ণ তেজে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই শব্দই পাচ্ছিলাম এতক্ষণ! এরপর তো আর দেরি চলে না। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ছোঁয়াছুঁয়ি খেললাম, ডুবে থাকলাম, ভেসে তো থাকলামই। উঠতেই চাইছিলাম না। কিন্তু ফিরোজা খালা ছাড়ল না। ঘণ্টা তিনেক পর তো প্রায় কান ধরেই উঠাল। বিকেল হয়ে গিয়েছে। বাইরে আমাদের জন্য অটোরিকশা চালক উজ্জ্বল মিঁয়া অপেক্ষা করছিলেন। হোটেলে খেয়ে অটোরিকশায় উঠে বসলাম।

www.amaderchhuti.com

জাফলং নদী থেকে পাথর তোলার দৃশ্য

পরদিন সকালে বের হলাম জাফলং ও তামাবিল যাওয়ার জন্যে। উজ্জ্বল মিঁয়াকে ফোন করে বলে দিলাম অটোরিকশা নিয়ে আসার জন্য। ততক্ষণে আমরা সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। জাফলং যাওয়ার পথে চোখে পড়ল বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড় আর অনেকগুলো ঝরনা। পাহাড়গুলো এত উঁচু যেন মেঘ ছুঁয়ে আছে। ঝরনাগুলো ভারতের সীমান্তের ভেতরে থাকায় কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতের মেঘালয় রাজ্য ঘেঁষে জাফলং অবস্থিত। জাফলং যাওয়ার পথেই তামাবিল চেক পোস্ট। যাকে বলা হয় তামাবিল জিরো কিলোমিটার সেখান থেকে বিএসএফ ক্যাম্প খুব কাছে। দেখলাম ভারতীয় ট্রাক মাল নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে মনের আনন্দে ছবি তুললাম। তারপর সোজা জাফলং। জাফলং-এ আছে পাহাড়, ঝরনা, কমলা বাগান, চা বাগান ও ডাওকি নদী। ডাওকি নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যায়। এই এলাকার মানুষের জীবিকা গড়ে উঠেছে পাথর উত্তোলনে। জাফলং যাওয়ার পর চোখে পড়ল নদী থেকে পাথর তোলার পরিচিত দৃশ্য। জাফলং-এ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করে কেটে গেল সারাদিন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত - তামাবিল

~ মাধবকুণ্ডের তথ্য ~

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ফাউন্ডেশন কোর্সে পাঠরত রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। পড়াশোনার পাশাপাশি বেড়ানো আর ভ্রমণ সাংবাদিকতা তার পছন্দের বিষয়।

Rate This : - select -
Total Votes : 26
Average : 4.69

Like Kakali Sengupta and 17 others like this.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

ছোট ভ্রমন কাহিনী ভালো লাগে।

- মামুন আজিজ [2013-08-25]

সিলেটের ছবি গুলো সুন্দর।

- আরিফ [2013-08-20]

আমি আপনাদের নওগা, বাঙলাদেশ প্রতিনিধি হতে চাই। s.m Ainul islam Cell: +8801710001211 Naogaon, Bangladesh.

- s. m Ainul [2013-08-15]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher